কিতাবুত্‌ তাহ্‌রীদ্‌
(২)
মুস‘আব ইলদিরিম

কিতাবুত্ তাহ্রীদ 'আলাল ক্বিতাল

পর্ব ২:

তাওহীদ
ও
জিহাদ

بسم الله الرحمن الرحيم

কিতাবুত্ তাহ্রীদ্ 'আলাল ক্বিতাল

দ্বিতীয় পর্ব: তাওহীদ ও জিহাদ

সূচিপত্র

একটি দুর্দান্ত উক্তি

মিসরের প্রসিদ্ধ আলেম, 'তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন'- এর লেখক সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (রহ.) যখন মিশরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র মর্মকথা তুলে ধরলেন, বিশেষ করে 'মাআ'লিম ফিত্ তরিক্ব' বা 'ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা' নামক বইটি লিখলেন তখন মিশরের যুবকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে। তারা আবার নতুন করে ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে মিশর সরকার তাকে গ্রেফতার করে। শেষ পর্যন্ত তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসির রায় কার্যকর হওয়ার পূর্বে কোন এক সময় একজন আলেম তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। সাইয়্যেদ কুতুব (রহ.) তার আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ইমাম সাহেব বললেন, 'আপনার তো কিছুক্ষণ পরে ফাঁসি কার্যকর হবে। আর আমার দায়িত্ব হলো যে সকল মুসলিম বন্দিদের ফাঁসি দেওয়া হয় তাদেরকে তওবা করানো এবং কালেমাতুশ শাহাদাত পাঠ করানো।'

সাইয়্যেদ কুতুব (রহ.) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কালেমাতুশ শাহাদাত পাঠ করান? বলুনতো আপনার কালেমায়ে শাহাদাতটা কী? ইমাম সাহেব বললেন, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।' সাইয়্যেদ কুতুব (রহ.) বললেন, "আশ্চর্য কথা! এই কালেমার কথা বলার জন্যই তো আমার ফাঁসি হচ্ছে। যেই কালেমার কথা বলার অপরাধে আমার ফাঁসি হচ্ছে, সেই একই কালেমা পড়ানোর বিনিময়ে সরকার তোমাকে পয়সা দিচ্ছে। যেই কালেমা বলার অপরাধে সরকার আমার জীবনাবসান করছে, ঐ একই সরকার

তোমাকে ঐ কালেমা পড়াবার জন্য জীবিকা দিচ্ছে। বুঝা গেল তোমার কালেমা আর আমার কালেমা এক নয়। ”

সুব্হানাল্লাহ!! কী দুর্দান্ত উক্তি! কী ভয়ংকর কথা!! আমার কালিমা তোমার কালিমা এক নয়!!!

প্রিয় ভাই! কখনো ভেবেছেন কি এভাবে?? আমার কালেমাটা আসলে কেমন? আমার কালেমার যে অর্থ আমি নিয়েছি, আমি কালেমাটাকে যেভাবে বুঝেছি, সেটা কি ঠিক আছে? সেটা কার সাথে মিলে? সেটা কি প্রিয় রাসূলের ﷺ কালেমার সাথে মিলে? সেটা কি হযরত আবু বকর, উমর, উসমান আর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম আযমাইনদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? নাকি আমি মনগড়া একটি অর্থ দাঁড় করিয়েছি?

সাইয়্যেদ কুতুব (রহ.) তাঁর এই উক্তি “তোমার কালেমা আর আমার কালেমা এক নয়।”- এর দ্বারা আর কী বুঝে আসে চলুন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক, তাহলেই বুঝে আসবে ইনশাআল্লাহ- আমি আসলে কোন্ কালেমার অনুসারী!

“তোমার কালেমা আর আমার কালেমা এক নয়।”-কথাটির অর্থ আর কী কী হতে পারে?:

১. তোমার কালেমা তাগুতের পয়সা খাওয়ায়, আমার কালেমা তাগুতের ফাঁসিতে ঝুলায়। তাই তোমার কালেমা আর আমার কালেমা এক নয়।
২. তোমার কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তাগুতের সংবিধান 'সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ' এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আমার কালেমা শিখায় সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ, জনগণ নয়।

৩. তোমার কালেমা তাগুতের সংবিধানে লিখিত 'দেশের সংবিধান সর্বোচ্চ আইন; অন্যান্য আইনের যতখানি ঐ সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল ঐ আইনের ততখানি বাতিল' এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আমার কালেমা আমাকে শিখায় আল্লাহ্‌র কুরআনই সর্বোচ্চ আইন। মানবরচিত অন্যান্য যত আইন-বিচার রয়েছে তার যতখানি ঐ কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক ততখানি বাতিল।

৪. তোমার কালেমা তোমাকে কেবল আসমানের উপরের কথা আর যমীনের নিচের আলোচনা করতে শিখায়। যমিনের উপরে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা, ব্যাংকে, আদালতে, সংসদে, ব্যবসা বাণিজ্যে আল্লাহর বিধান কায়েম করতে শিখায় না। আমার কালেমা আমাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে দ্বীনকে বিজয়ী করতে শিখায়।

৫. তোমার কালেমা তোমাকে ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে 'রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্ম' পালন করতে শিখায়। আমার কালেমা আমাকে রাসূল ﷺ এর পদ্ধতিতে রাজনীতি করতে শিখায়। আমাকে আরও শিখায় 'ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতি' যেমন একটি কুফুরী মতবাদ তেমনিভাবে 'রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্ম'ও একটি কুফুরী মতবাদ।

৬. তোমার কালেমা তোমাকে জিহাদ বিমুখ বানায়। আর আমার কালেমা আমাকে দাওয়াত, হিজরত, জিহাদ ও ক্বিতাল- সবই শিখায়।

৭. তোমার কালেমা তোমাকে কাফের-মুশরিক ও মুরতাদ-মুনাফিকদের থেকে আল-বারাআহ্ (সম্পর্ক ছিন্ন করা) করতে শিখায় না। আর আমার কালেমা আমাকে মুমিনদের সঙ্গে আল-ওয়ালা (বন্ধুত্ব) এবং আল্লাহদ্রোহী কাফের-মুশরিক, মুরতাদ-মুনাফিক ও সকল প্রকার তাগুত থেকে আল-বারাআহ্ করতে শিখায়।

৮. তোমার কালেমা মুমিন (মুজাহিদ)-দেরকে অপছন্দ করতে শিখায় আর কাফেরদের প্রতি কোমলহৃদয় বানায়। পক্ষান্তরে আমার কালেমা কুফ্ফারদের প্রতি কঠোর ও মুমিন/মুজাহিদদের প্রতি রহমদীল বানায়।

৯. তোমার কালেমার দাওয়াত প্রচার করতে ইয়াহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ কারো কোনো বাধা নেই। বরং তাদের দেশেও তোমার কালেমার প্রচার-প্রসারের জন্য আনন্দের সঙ্গে ভিসা দেয়। আর আমার কালেমার আওয়াজ শুনলেই তাদের শরীরে চুলকানি শুরু হয়ে যায়। তাদের দেশে যেতে দেয়া তো দূরে থাক, পারলে আমার দেশে এসে আমাকে হত্যা করে দিয়ে যায়।

১০. তোমার কালেমার সভা-সেমিনারে তাগুতেরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। তোমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে থাকে। তারা দল বেধে তোমার কাছে দুআ চাইতে আসে। আর আমার ক্ষেত্রে? তাগুতেরা সর্বশক্তি ব্যায় করে আমাকে খোঁজে পাওয়ার জন্য, আমাকে ধরা কিংবা শহীদ করার জন্যে।

১১. তোমার কালেমার কারণে বাতিল তোমাকে 'হুযুর হুযুর' করে, আর আমার কালেমার কারণে বাতিল আমাকে মৌলবাদী, সন্ত্রাসী ও জঙ্গী ট্যাগ লাগায়।

১২. তোমার কালেমার বদৌলতে তোমাকে হোয়াইট হাউসে দাওয়াত দিয়ে কোরমা-পোলাও খাওয়ানো হয়, আর আমার কালেমার কারণে হোয়াইট হাউস হতে আমার মাথার মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

১৩. তোমার কালেমা তোমাকে শাহবাগ চত্বরে নাস্তিকদের স্টেজে নিয়ে যায় আর আমার কালেমা শাপলা চত্বরে আমার বুকের রক্ত ঝরায়।

১৪. যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে নিয়ে কটুক্তি করা হয়, তখন তোমার কালেমা তোমাকে তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী বানায়। আর আমার কালেমা খোদার দুশমনদের জাহান্নামে পাঠাতে শিখায়।

১৫. তোমার কালেমা তোমাকে তথাকথিত শান্তি(?)প্রিয়, সুবিধাবাদী আর তাগুতের সুবিধাভোগী পা-চাটা গোলাম বানায়। অন্যদিকে আমার কালেমা তাগুত বিরোধী, তাগুত রাষ্ট্রে দেশদ্রোহী, মরণজয়ী মুজাহিদ বানায়।

অতএব, বুঝা গেল, তোমার কালেমা আর আমার কালেমা এক নয়। তোমার কালেমার অর্থ আল্লাহ্‌র রাসূলের ﷺ কালেমার সাথে মিলে না। মিলে আমারটার সাথে। কেননা এই কালেমার কথা বলার কারণেই তাঁর উপর ধেয়ে এল সব বিপদ-আপদ আর ঝড়-ঝাপটা। এই কালেমার কথা বলার জন্য কতই না কষ্ট সহ্য করেছেন তিনি। বরং তাঁকে যত কষ্ট দেয়া হয়েছে, তত কষ্ট অন্য কোনো নবী রাসূলকেও দেয়া হয়নি।

তুমি কি দেখনি, মক্কার কুরাইশরা তাঁকে গালমন্দ করেছে, অপবাদ দিয়েছে, রক্তাক্ত করেছে, তাঁর উপর উটের ভুঁড়ি নিক্ষেপ করেছে?

তায়েফে কি দেখনি, তাঁকে কিভাবে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে প্রস্তারাঘাতে? তাঁর দু'পা রক্তাক্ত হয়ে তাঁর জুতো রক্তে পূর্ণ হয়ে গেল।

তুমি কি দেখনি, পাথরের আঘাতে তিনি কিভাবে পড়ে যাচ্ছিলেন, আর দুর্বৃত্তরা তাকে উঠিয়ে পুনরায় পাথর নিক্ষেপ করছিল, তবুও তিনি বলে যাচ্ছিলেন "প্রভু হে! ক্ষমা করো আমার জাতিকে, ওরা যে বুঝে না"?

আর ওহুদের যুদ্ধে? আহ! কুফ্ফারদের আঘাতে তাঁর ডান দিকের নীচের দাঁত মোবারক ভেঙ্গে যায়, নীচের ঠোঁট আহত হয়। কপালে জখম হয়। তাঁর শিরস্ত্রাণের দুটো অংশ ভেঙ্গে তাঁর চোয়ালের ভেতরে ঢুকে যায়। অতঃপর মুসলমানদেরকে তাদের অজান্তে ফেলে মারার জন্য কুফ্ফাররা যে গর্ত খুড়ে রেখেছিল, তার একটিতে পড়ে যান তিনি। দ্বীনের এই কালিমার প্রচারের জন্য তাঁর মতো কষ্ট ও ত্যাগ কে স্বীকার করেছে?

তুমি কি তাঁর সীরাত পাঠ করনি? এই কালেমার জন্যই তিনি প্রত্যক্ষভাবে ২৭ টি যুদ্ধ (গাযওয়া) করেছেন, আর পরোক্ষভাবে ৪৬ টি সারিয়্যা (অভিযান) পরিচালনা করেছেন।

সুতরাং, সব কথার শেষ কথা-"ওহে ভাই! তোমার কালেমা আর আমার কালেমা এক নয়। তোমার কালেমা আর রাসূলের কালেমাও এক নয়। বরং রাসূলের কালেমা ও আমার কালিমা এক ও অভিন্ন। রাসূলের মানহাজই আমার মানহাজ। তাই ভাই, দুনিয়া ও আখিরাতে প্রকৃত সফলতা ও মুক্তি পেতে রাসূলের কালিমাকে রাসূলের মতো করে বুঝার চেষ্টা করো, সেই কালেমাকে নিজের মাঝে ধারণ করো, কালিমার সেই খুনরাঙা পথে চলা শুরু করো, সেই কালিমা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করো, সেই কালেমার জন্যই নিজের জান-মাল-সময় সব কুরবানী করার চেষ্টা করো।"

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

আমার কালেমার অর্থ

তাহলে, ভাই! আপনি কি জানতে চান আমার কালেমার অর্থটা কী? তাহলে জেনে নিন-

তাওহীদের কালেমা চারটি অংশে বিভক্ত, যথা:

কালেমার প্রথম অংশ: 'লা ইলাহা'

কালেমার দ্বিতীয় অংশ: 'ইল্লাল্লাহু'

কালেমার তৃতীয় অংশ: 'মুহাম্মাদ'

কালেমার চতুর্থ অংশ: 'রাসূলুল্লাহ'

- **কালেমার প্রথম অংশ: 'লা ইলাহা'র অর্থ:**

আমার কালেমা আমাকে শিখায়- আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান আনার আগে প্রথমে আল্লাহ্ ব্যতীত সকল মা'বুদ/উপাস্য তথা ইলাহ্গুলোকে পরিত্যাগ করতে হবে। শরীয়তের ভাষায় এই ইলাহ্দেরকে 'তাগুত'

বলে। [সূরা বাকারা ২:২৫৬-২৫৭; সূরা নিসা ৪:৫১,৬০,৭৬; সূরা মায়েদা ৫:৬০; সূরা নাহ্ল ১৬:৩৬; সূরা যুমার ৩৯:১৭]

"তাগুতের" আরেকটি সংজ্ঞা হল- যাদের কারণে বান্দা ইবাদত, আনুগত্য, অনুসরণ কিংবা ভালোবাসার ক্ষেত্রে সীমালজ্ঘন করে তাদেরকে 'তাগুত' বলা হয়। আল্লাহ্র উপর ঈমান আনার (ঈমান বিল্লাহ অর্থাৎ 'ইল্লাল্লাহ'র ঘোষণা দেয়ার) জন্য সর্বপ্রথম কাজ হল কুফর বিত্-তাগুত ('লা ইলাহা'র ঘোষণা দেয়া অর্থাৎ তাগুতকে অস্বীকার/পরিহার করা)।

এখন প্রশ্ন হল, কারা এই তাগুত??

আল্লাহ ব্যতীত যত কিছুর ইবাদত করা হয়, তার সবই তাগুত বলে আমরা বিশ্বাস করি। তাগুত বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন:

১. শয়তান [সূরা নিসা ৪:১১৯; সূরা ফাতির ৩৫:৬; সূরা ইউসূফ ১২:৫২; সূরা বাকারা ২:১৬৮-১৬৯]
২. আল্লাহ্র আইনের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নকারী সম্প্রদায় (যেমন: তাগুত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, এমপি, মন্ত্রী, ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিবৃন্দ) [সূরা মায়েদা ৫:৫০; সূরা নিসা ৪:৬০]
৩. আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পাদনকারী সম্প্রদায় (যেমন: তাগুত রাষ্ট্রের জজ, ব্যরিস্টার, উকিল ইত্যাদি) [সূরা মায়েদা ৫:৪৪; সূরা নিসা ৪:৬৫]
৪. ইসলামের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগকারী সম্প্রদায় (যেমন: তাগুত রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী- সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কারারক্ষী ইত্যাদি) [সূরা নিসা ৪:৭৬]
৫. গায়েবের ইলম দাবীকারী।

৬. আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয় এবং সে ঐ ইবাদতে সন্তুষ্ট থাকে। ইত্যাদি।

প্রিয় ভাই! এ সবই তাগুত, এদেরকে অস্বীকার ও পরিত্যাগ (কুফর বিত-তাগুত) না করে আল্লাহর উপর ঈমান (ঈমান বিল্লাহ), ঈমান হিসেবে সাব্যস্ত হয় না এবং তা দ্বারা মুসলমান হওয়া যায় না।

আর যারা তাগুতের সহযোগী হবে, কুরআনের ভাষায় এরা হল "আউলিয়াআশ্ শাইত্বন" বা শয়তানের ওলী-আউলিয়া তথা শয়তানের বন্ধু বা চ্যালা-প্যালা।

আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ-

فَقَٰتِلُوٓاْ أَوۡلِيَآءَ ٱلشَّيۡطَٰنِۖ إِنَّ كَيۡدَ ٱلشَّيۡطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦

"অতএব, তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, (দেখবে,) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।" (৪ সূরা নিসা: ৭৬)

শয়তানকে মানুষ ইলাহ বানিয়ে পূঁজা করে এটা তো স্পষ্ট। প্রশ্ন হলো- **উপরে বর্ণিত বাকী তাগুতগুলো কিভাবে 'ইলাহ' হয়??? এদেরকে কেন বর্জন করতে হবে?**

عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال: يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت إنا لسنا نعبدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرمون

ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتستحلون قلت بلى قال فتلك عبادتهم.

আদী ইবনে হাতেম রাযি. (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি খ্রিস্টান ছিলেন) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। তখন আমার গলায় একটি ক্রুশ ঝুলছিল। তিনি বললেন, হে আদী! এই মূর্তিটি তোমার গলা থেকে ছুঁড়ে ফেল। আমি তা ছুঁড়ে ফেললাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে গেলাম। দেখলাম, তিনি সূরা বারাআ’র (সূরা তাওবা) এই আয়াত তিলাওয়াত করছেন:

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

‘তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে’। (সূরা তাওবাহ ০৯:৩১)

আমি আরজ করলাম, আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা‘আলা যা হালাল করেছেন, তারা তা হারাম করতো আর তোমরাও তা হারাম মানতে এবং আল্লাহ তা‘আলা যা হারাম করেছেন, তারা তা হালাল করতো আর তোমরাও তাকে হালাল মেনে নিতে। আমি উত্তর দিলাম- হ্যাঁ, এমনটি তো হয়েছে। তিনি বললেন, এটিইতো তাদেরকে ইবাদত করা। (আত্ তারিখুল কাবির লিল ইমামিল বুখারি: ৭ম খণ্ড, ৪৭১ নং হাদীস, সুনানুত্ তিরমিজি: ৫০৯৩)

প্রিয় ভাই!

যারা আল্লাহ্‌র বিধানের মোকাবেলায় বিধান রচনা করে, আল্লাহ্ তা‘আলার কৃত হালালকে হারাম করে আর হারামকৃতকে হালাল করে, এরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকে ‘বিধানদাতা’র (আল্ হাকীম) আসনে নিজেকে সমাসীন করলো, যা আল্লাহ্ তাআলার একটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য, যা কেবল

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের জন্যই খাস। তাই এরা নিজেরা মুশরিক এবং এদেরকে যারা মেনে নিবে, এদেরকে যারা সমর্থন করবে, এদেরকে সহযোগিতা করবে, এদেরকে নিরাপত্তা দিবে, এদের পক্ষে বল প্রয়োগ করবে, এদেরকে ভালোবাসবে, এদের বানানো বিধানে যারা বিচারকার্য পরিচালনা করবে, এদের কাছে যারা বিচার প্রার্থনা করবে, এদেরকে প্রশংসা করবে, এদের বানানো বিধান বাস্তবায়নের মাঝে যারা দেশ ও জাতির সফলতা খোঁজে পাবে, এরা সকলেই আল্লাহ্র সাথে শির্ক ও কুফরী করল।

আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান তথা তাওহীদের উপর বিশ্বাস করার পূর্বে নিচের কাজগুলো করতে হবে (এই কাজগুলোকে 'কুফর বিত্ তাগুত' বলে-

১. এ সকল তাগুতের ইবাদত, আনুগত্য, অনুসরণ ও ভালবাসাকে কুফরী ও বাতিল বলে জানা;
২. তাদের ইবাদত, আনুগত্য, অনুসরণ ও ভালোবাসা পরিত্যাগ করা; (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪)
৩. এদের সাথে আল বারাআহ্ (সম্পর্ক ছিন্ন) করতে হবে, এসকল ইলাহ্/তাগুতদেরকে পরিত্যাগ করতে হবে, (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪)
৪. এদেরকে মন ভরে ঘৃণা করতে হবে (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪)
৫. এদের প্রতি পরিপূর্ণরূপে শত্রুতা এবং বিদ্বেষ পোষণ করতে হবে (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪)
৬. এদের প্রতি কঠোর হতে হবে (সূরা তাহরীম ৬৬: ৯;সূরা ফাত্হ ৪৮:২৯)
৭. এদেরকে আল্লাহ্র দুশমন মনে করতে হবে (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪)

৮. এদের সাথে নিজের জানের দুশমনের মত ব্যবহার করতে হবে (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪),

৯. এদেরকে পরিপূর্ণরূপে বয়কট করতে হবে (সূরা বাকারা ২:২৫৬-২৫৭;সূরা নাহ্‌ল ১৬:৩৬)

১০. এদের সভা-সেমিনারে যোগদান করা যাবে না,

১১. এদের কোনো হাদিয়া-তোহফা নেয়া যাবে না,

১২. এদেরকে হারামখোর জ্ঞান করতে হবে, এদের উপার্জন হারাম

১৩. এদেরকে সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট কুলাঙ্গার মনে করতে হবে (সূরা বায়্যিনাহ ১০০:৬),

১৪. এদেরকে মুক, বধির ও অন্ধ জানতে হবে (সূরা বাকারা ২:১৮),

১৫. এরা চতুষ্পদ জানোয়ারের ন্যায়, বরং এর চেয়েও নিকৃষ্ট (সূরা আল আনআম ৭:১৭৯),

১৬. এদেরকে দুনিয়া থেকে মিটানোর আগ পর্যন্ত জিহাদ করে যেতে হবে (সূরা বাকারা ২:১৯৩,সূরা আল আনফাল ৮:৩৯)

১৭. এদেরকে "কাফেরের গোষ্ঠী" (দলগতভাবে কাফের) জ্ঞান করতে হবে। (ফলে, 'এলায়ে কালিমাতুল্লাহ' তথা আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য কাফেরদের মত এদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা হবে।) (সূরা মায়েদা ৫:৪৪)

তাগুতকে এভাবে পরিত্যাগ বা অস্বীকার করা ব্যতীত যথাযথভাবে 'কুফর বিত-তাগুত' (তাগুতকে অস্বীকার ও পরিত্যাগ) সাব্যস্ত হয় না। এর সবই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

এভাবে যে এদের সাথে আল-বারাআহ্ করতে পারবে সেই প্রকৃতপক্ষে 'লা ইলাহা' বলল। সেই আসলে বলল, আল্লাহ্‌র আগে-পরে আর কাউকে 'ইলাহ্' হিসেবে গ্রহণ করিনি।

কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার পর নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আদায় করা, কিংবা তা'লীম-তরবীয়ত, দাওয়াত, তাযকিয়া ইত্যাদির মেহনত করার পরও এই সকল ইলাহ্‌ বা তাগুতকে পরিষ্কার করে (উপরোল্লিখিত ভাবে) পরিত্যাগ করতে হবে। এভাবে তাগুতকে বর্জন না করলে প্রকৃতপক্ষে "লা ইলাহা" বলা হলো না।

অর্থাৎ, আমার কালেমার প্রথম কথা হল, "আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার জন্য এই সকল তাগুতকে পরিহার করার নামই হল 'লা ইলাহা'"।

এক্ষেত্রে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ হল আমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)।

আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ

"তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীদের মাঝে উত্তম আদর্শ আছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মাঝে ও আমাদের মাঝে চিরশত্রুতা থাকবে।"

(সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪)

• কালেমার দ্বিতীয় অংশ: 'ইল্লাল্লাহু'র অর্থ

আমার কালেমার দ্বিতীয় কথা হল, উপরোল্লিখিত উপায়ে সকল মিথ্যা ইলাহ বা তাগুতকে অস্বীকার করার পর একজন মুসলিম 'ইল্লাল্লাহু' বলার উপযুক্ত হয়। এই 'ইল্লাল্লাহ'ই হচ্ছে তাওহীদ (একত্ববাদ)।

তাওহীদ চার প্রকার-

১. তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ্ (توحيد الربوبية): (রব' শব্দ হতে রুবুবিয়্যাহ) আল্লাহ্ পাককে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা এবং একমাত্র বিধানদাতা হিসেবে বিশ্বাস করা। এই চার গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান তিনিই আমাদের আল্লাহ্; আমাদের মহান প্রতিপালক।

২. তাওহীদে উলুহিয়্যাহ/তাওহীদে 'ইবাদাহ (التوحيد في /توحيد الألوهية العبادة): ('ইলাহ্' শব্দ হতে উলুহিয়্যাহ) একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই বান্দার ইবাদত পাওয়ার যোগ্য-একথা মেনে নেয়া এবং আল্লাহ্ পাকের সকল প্রকার বিধি-নিষেধ কেবল তাঁর জন্যই খাসভাবে করা (অন্য কোনো তাগুত/উপাস্যের ইবাদত ও আনুগত্য না করা)।

৩. তাওহীদে আস্‌মা (নাম) ওয়াস্ সিফাত (গুণ) (توحيد الأسماء والصفات): আল্লাহ্ পাকের গুণবাচক যে সকল নাম বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলো একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই খাস- একথাকে বিশ্বাস করা।

৪. তাওহীদে হাকামিয়্যাহ্ (توحيد الحاكمية): ('হুকুমত/হাকীম' শব্দ হতে হাকামিয়্যাহ) এটি মূলত 'তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ্'র অন্তর্ভূক্ত। তবে গুরুত্বের বিচারে এটিকে আলাদা করা হয়েছে। 'তাওহীদে

হাকামিয়্যাহ'র অর্থ হচ্ছে- আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, **রাষ্ট্রীয়** এবং আন্তর্জাতিক সকল প্রকারের বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র এবং কেবলমাত্র আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলার।

প্রিয় ভাই! তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ তথা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন, আল্লাহ খাওয়ান, আল্লাহ্ পালেন- এই কথাগুলোর উপর মক্কার কুরাইশদেরও ঈমান ছিল। তথাপি আল্লাহ্র রাসূল ﷺ এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। বুঝা গেল, শুধুমাত্র তাওহীদের রুবুবিয়্যাহ্র উপর ঈমান আনাই যথেষ্ট নয়। মক্কার কাফেরদের তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ্- এর উপর বিশ্বাস ছিল ঠিকই, কিন্তু তারা তাওহীদে উলুহিয়্যাহ/ইবাদাহ এবং তাওহীদের হাকামিয়্যাহকে মেনে নেয়নি। তাই এরা মুশরিক এবং কাফের সাব্যস্ত হয়েছিল।

বর্তমান যামানায় তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ, তাওহীদে উলুহিয়্যাহ এবং তাওহীদে আসমা ওয়াস সিফাতকে মেনে নিবে কিন্তু তাওহীদে হাকামিয়্যাহ্-কে মানবে না, কিংবা কার্যক্ষেত্রে সে মানবরচিত বিধানকে প্রাধান্য দিবে, কিংবা মেনে নিবে, সেও মক্কার কাফেরদের ন্যায় মুশরিক ও কাফের হয়ে যাবে। (নাউযুবিল্লাহি মিন্ যালিক)

আশাকরি, এতক্ষণের আলোচনা হতে এই বিষয়টি পরিষ্কার যে, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার পূর্বে তাগুতকে অস্বীকার করতে হবে। অতঃপর আল্লাহ্র উপর ঈমান আনতে হবে অর্থাৎ চার প্রকারের তাওহীদকেই পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হবে। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন-

فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

"যে তাগুতকে অস্বীকার করল ('লা ইলাহা'র উপর আমল করল) এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনল ('ইল্লাল্লাহ্' এর চারটি তাওহীদকে গ্রহণ করল), সে এমন এক মজবুত হাতল ধারণ করল যা কখনো ভাঙ্গবার নয়। আর আল্লাহ সবকিছু শুনেন এবং জানেন।" (সূরা বাকারাহ ২: ২৫৬)

প্রিয় ভাই! 'আল্লাহ্‌র উপর ঈমান' নিচের ছয়টি কাজের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। যথা:-

১. তাগুতকে অস্বীকার/বর্জন করা
২. চার প্রকারের তাওহীদকে গ্রহণ করা
৩. সকল প্রকারের ইবাদত-বন্দেগী একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই করা।
৪. আল্লাহ্ তা'আলাকে সকল কিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসা।
৫. আল্লাহ্‌র জন্য বন্ধুত্ব করা (আল-ওয়ালা) এবং
৬. আল্লাহ্‌র জন্যই শত্রুতা করা (আল-বারাআহ্)।

• কালেমার তৃতীয় অংশ: 'মুহাম্মাদ' এর অর্থ:

আমার কালেমার তৃতীয় কথা হচ্ছে, ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে সবচেয়ে বেশি, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসা। প্রিয় নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন,

لا يُؤْمِنُ أحدُكم حَتّٰى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّلَدِهِ، وَوَالِدِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পুত্র, তার পিতা এবং অপরাপর সকল মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হব।" (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসার অর্থই হচ্ছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য নিজের জীবন দিতে সদাপ্রস্তুত থাকা। কেননা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি মহব্বত করব, কিন্তু জিহাদ করে নিজের জীবন দিতে পারবো না, তাহলে এটি একটি মিথ্যা ও হাস্যকর দাবী। কেননা, নিজের জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসার দাবীই হল, যখন জীবন চাওয়া হবে, সেটা জিহাদের ময়দানেই হোক কিংবা অন্য যে কোনো তাকাজাতেই হোক, সাথে সাথে জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া।

• কালেমার চতুর্থ অংশ: 'রাসূলুল্লাহ' এর অর্থ

আমার কালেমার চতুর্থ কথা হচ্ছে, একথা বিশ্বাস করা যে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ- আল্লাহ্‌র বান্দা ও সর্বশেষ রাসূল। আমাদের যিন্দেগীর প্রতিটি কাজে,

সকল ক্ষেত্রে নবীজি ﷺ-কে পরিপূর্ণরূপে আনুগত্য প্রদর্শন করা ও সুন্নাহ্র অনুসরণ করা।

আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদেরকে কালেমার সঠিক অর্থ বুঝবার এবং তদনুযায়ী আমল করবার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সকাল বেলার মু‘মিন রে তুই, কাফির সন্ধ্যা বেলা:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا.(مسلم،ج:١ ص:١١٠ ، صحيح ابن حبان، ج:١٥ ص:٩٦)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন-

“ফেতনাসমূহ প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই যা নেক আমল করার, দ্রুত করে ফেল! কেননা, ফেতনাসমূহ অন্ধকার রাত্রির অংশের মত (কালো) হবে (মানুষ বুঝতেই পারবে না যে সে ফেতনায় পতিত হচ্ছে)। ঐ ফেতনার সময় মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, সন্ধায় কাফের হয়ে যাবে। অথবা সন্ধায় মুমিন থাকবে, সকালে কাফের হয়ে যাবে। দুনিয়ার তুচ্ছ লাভের আশায় স্বীয় দ্বীনকে বিক্রি করে দিবে।” (সহীহ মুসলিম, সহীহ ইবনে হিব্বান)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يأتي على الناس زمان، الصابر فيها على دينه كالقابض على

الجمر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. وصححه الألباني (سنن الترمذي: ج:٤ ص:٥٢٦)

"মানুষের উপর এমন একটা সময় আসবে যখন দ্বীনের উপর অটল থাকা হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মত কঠিন হয়ে যাবে।" (তিরমিযি)

প্রিয় ভাই!

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বর্তমান যামানাই সেই যামানা যখন একজন মানুষ সকাল করছে ঈমানদার হিসেবে, আর বিকালেই কাফের হয়ে যাচ্ছে। কিংবা সন্ধ্যায় মুসলমান আর সকালেই কাফের হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু সে বুঝতেই পারছে না। কেননা, সে তো সকাল সন্ধ্যা নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করছে, সিয়াম পালন করছে। সকাল-সন্ধ্যা তাসবীহ-তাহলীল আদায় করছে। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে কিভাবে সে কাফের হয়ে গেল?

অনেকে মনে করেন, বর্তমান যামানায় রাস্তা-ঘাটে বের হওয়া যায় না, চারদিকে কেবল নারীর ফেতনা। তাই ঈমান ধরে রাখা হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখার চেয়েও কঠিন। কিন্তু ভাই! নারীর ফেতনায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা খুব বেশি থেকে বেশি 'ফিস্‌ক্' এর গুনাহ্ (গুনাহে কবীরা) হবে, এটা তো আর কুফর নয়। তাহলে? মানুষ কিভাবে খুব সহজেই ঈমান হারা হয়ে যাচ্ছে?

একটা বিষয় আমাদের স্পষ্ট হওয়া দরকার। পূর্বের যামানায় একজন মানুষকে মুশরিক বা মুরতাদ হওয়ার জন্য ইসলাম ত্যাগের ঘোষণা দিতে হত বা মূর্তির সামনে সিজদা দিতে হত, কিংবা কোনো ফরযকে অস্বীকার

করতে হত। কিন্তু বর্তমান যামানার ফিতনাগুলো এতটাই ভয়াবহ এবং নিকষ কালো আঁধারের ন্যায় যে, একজন মানুষকে মূর্তির সামনে সিজদা করা ব্যতিরেকেই কিংবা মৌখিক ঘোষণা দেয়া ছাড়াই বে-ঈমান, কাফের কিংবা মুশরিক ও মুরতাদ বানিয়ে দেয়। বর্তমান জামানার ফেতনাগুলো কখনোই আমাদেরকে বলবে না যে, তুমি ব্যক্তিগত পর্যায়ে দ্বীনকে অনুসরণ করো না, বরং কখনো কখনো এমন দ্বীনদারিকে উৎসাহিতও করবে; এসকল ফেতনা আমাদেরকে কেবল এতটুকু বলবে, ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে দাও, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। রাষ্ট্র চলবে মানবরচিত বিধানে, আর যার যার ধর্ম সে সে পালন করবে। ব্যস! কাফের হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

ধরা যাক! একজন মানুষ যদি রাষ্ট্রের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (যা একটি সুস্পষ্ট নাস্তিক্যবাদী মতবাদ এটা)-কে মেনে নেয়, বা যদি মনে করে এতে কোন সমস্যা নেই, বা মনে করে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য এটিই বেশি উপযোগী ইত্যাদি; তবে তার ঈমান চলে যাবে, যদিও সে সালাত-সিয়াম-হজ্জ-যাকাত-দান-সাদাকা-দাওয়াত-তাযকিয়া ইত্যাদি আমলগুলো খুব জোরদার বা মজবুতির সাথে করে থাকে।

এরপর আরোও ধরা যাক 'গণতন্ত্রের' কথা! কোনো মানুষ যদি এমনটি মনে করে যে, মানুষের আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা আছে বা মানুষ নিজেই নিজের রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের অধিকার রাখে বা জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস, সে যদি জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে অংশ নেয় (হয়ত নিজে এমপি পদের জন্য প্রার্থী হয় বা এমপিদেরকে ভোট দেয়), তার এই আকীদা ও আমল-ই তার ঈমানকে 'নাই' বানিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট, যদিও সে

সালাত-সিয়াম-হজ্জ-যাকাত-দান-সাদাকা-দাওয়াত-তাযকিয়া ইত্যাদি আমলগুলো খুব জোরদার, মজবুতি বা ইস্তিকামাতের সাথে করে থাকে।

এছাড়াও ঈমান ভঙ্গের আরো সুস্পষ্ট কিছু কারণ আছে, যেগুলো কারো মধ্যে পাওয়া গেলে সে কাফের হয়ে যাবে, যদিও সে বাহ্যিক সুরতে 'লেবাসধারী' দ্বীনদার হয়ে থাকে। ঈমান ভঙ্গের কারণগুলো হল-

১. **আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা:** [সূরা নিসা ৪:৪৮; সূরা মায়িদাহ্ ৫:৭২; সূরা যুমার ৩৯:৬৫; সূরা লোক্বমান ৩১:১৩]

২. **আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে মাধ্যম সাব্যস্ত করা:** [সূরা যুমার ৩৯:৩]

যেমন কেউ যদি মনে করে যে, আল্লাহ্‌র কাছে কিছু পেতে হলে পীর ধরতে হবে, পীর-ই আল্লাহ্‌র দরবারে আমাকে কবুল করাবে, অতঃপর আমার মনের বাসনা পূর্ণ হবে, আমার পীর পরকালে আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এই আকীদা শিরক্ ও কুফর।

৩. **কোন কাফেরকে কাফের মনে না করা।** [সূরা নিসা ৪:৫১]

যেমন: ইয়াহুদী-খ্রিস্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ বা এরকম অন্য কোনো কাফেরে আছলিকে কাফের মনে না করা বা তাদের ধর্মকে ভ্রান্ত মনে না করা কিংবা ভ্রান্তির ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় রাখা।

বি.দ্র: আমরা "যে ব্যক্তি কাফেরকে কাফের মনে করে না, সে নিজেই কাফের" কথাটাকে শুধুমাত্র তাকফিরুন নসের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ যেসব ব্যক্তি বা জাতি-গোষ্ঠীকে কোরআন সুন্নাহ সুস্পষ্ট কাফের আখ্যায়িত করেছে- তাদের ক্ষেত্রে) প্রযোজ্য মনে করি। এই কথাকে খারেজীদের মতো তাকফিরুল ইজতিহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করি না। যেমন- বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীকে আমরা মুরতাদ মনে করলেও কোন মুসলমান ইলমের স্বল্পতার কারণে কিংবা ভুল ব্যাখ্যার কারণে এদেশের

শাসকগোষ্ঠীকে মুরতাদ মনে না করলে, আমরা সেই ব্যক্তিকে কাফের মনে করি না- যেমনটা নব্য খাওয়ারেজরা করে থাকে।

৪. মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করা। [সূরা মায়িদাহ্ ৫:৫১]

যেমন: জাতিসংঘ 'পিস্ (শান্তি?) মিশনে' গিয়ে তাগুত সেনাবাহিনী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তখন তারা দলীয়ভাবে মুরতাদ হয়ে যায়।

৫. দ্বীনের কোনো বিষয়কে মন থেকে ঘৃণা করা। [সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৮-৯]

যদিও কোনো ব্যক্তি নিজে সে ঐ আমলগুলো করে। যেমন: পর্দাপ্রথাকে অপছন্দ করা, জিহাদকে অপছন্দ করার দ্বারা একজন কাফের হয়ে যাবে, যদিও সে অন্যান্য আমল একশতে একশ করে থাকে।

৬. দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা। [সূরা তাওবাহ্ ৯:৬৫-৬৬]

যেমন পর্দাকে 'তাবু'র সাথে তুলনা করে কটাক্ষ করা, মুজাহিদ ভাইদেরকে 'জঙ্গী' বলে গালি দেয়া ইত্যাদি কুফুরী।

৭. যাদু করা, যাদু শেখা। [সূরা বাকারা ২:১০২]

৮. আল্লাহ্র বিধানের উপর মানবরচিত বিধানকে প্রাধান্য দেয়া। ইসলামী শরীয়তকে পরিপূর্ণ মনে না করা, এর মধ্যে কিছু যোগ-বিয়োগ করার সুযোগ আছে মনে করা। কিংবা, ইসলামী শরীয়তের কোনো বিধান থেকে অন্য কোনো দ্বীন, আদর্শ বা বিধানকে উত্তম, যুক্তিযুক্ত বা অধিক পরিপূর্ণ মনে করা। [সূরা মায়িদাহ্ ৫:৪৪,৫০]

যেমন: গণতন্ত্র/সমাজতন্ত্র/ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ-কে রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা। নির্বাচনে অংশ নেয়া। জাতীয়তাবাদ/মুক্তচিন্তা/অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী হওয়া। এসকল তন্ত্র-মন্ত্রগুলোর মধ্যে জাতির মুক্তি নিহিত-এরূপ ধারণা করা। মানবরচিত

আইনে বিচার কার্য পরিচালনা করা। এই সকল লোকদের বা এই সিস্টেমের পক্ষে সমর্থন করা, দলের পক্ষে দাওয়াত দেয়া, অস্ত্র ধারণ করা, এদেরকে নিরাপত্তা দেয়া, এদেরকে অনুসরণ করা, জনশক্তি বা অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করা, এদেরকে ভোট দেয়া, এসব মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দেওয়া ইত্যাদি সবই কুফুরী।

৯. ভালোবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের উপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়া। [সূরা তাওবাহ্ ৯:২৪]

১০. দ্বীন থেকে পরিপূর্ণরূপে গাফেল বা বিমুখ থাকা। [সূরা আ‘রাফ ৭:১৭৯]
অর্থাৎ ঈমানদার হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলোও না জানা, না শিখা কিংবা গ্রহণ না করা। যেমন- জন্মসূত্রে মুসলিম কোন ব্যক্তির পিতা-মাতা কোন দিন তাকে ঈমান-ইসলাম শিখায়নি, সে নিজেও তা শিখেনি।

[বি.দ্রঃ কুফুরী কর্ম সম্পাদনকারী আর ‘কাফের’ এককথা নয়। একজনের মাঝে কুফরের আলামত পাওয়া গেলেই তাকে সাথে সাথে তাকফীর করা (কাফের ঘোষণা দেয়া) যায় না। সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির উপর **কুফর ও ইরতিদাদের হুকুম** আরোপ করার জন্য শরীয়তে অনেক শর্ত আছে; অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞতা (الجهل), তাবীল (التأويل) ইত্যাদির মত موانع التكفير তথা তাকফীরের প্রতিবন্ধক বিষয়গুলো লক্ষ্যনীয়। যেমন, কোন কোন আলেমের ভুল ইজতেহাদ ও অগ্রহণযোগ্য ফতোয়ার কারণে অনেকে ইসলামের নামে নাপাক গণতন্ত্রের খপ্পরে

পড়েছে। এ সমস্ত ‘ইসলামী গণতান্ত্রিকদেরকে’ তাদের তাবিলের (নুসুসের ভুল ব্যাখ্যা বুঝা, ভুল প্রয়োগ করা বা বাস্তবতার ব্যাপারে অজ্ঞতা- যা তাকফীরের প্রতিবন্ধক) কারণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফরীতে জড়িত হবার পরও আমরা তাদেরকে তাকফীর করি না। কিন্তু আমরা তাদেরকে ভুল পথের পথিক মনে করি এবং তাদের কাজকে হারাম মনে করি। গণতন্ত্রের ধোঁকা ও প্রতারণা তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করি। সঠিক পথে ফিরিয়ে এনে তাদের বিপ্লবী চেতনাকে ইসলামী পন্থা ও জিহাদের পথে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি। এমনিভাবে, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী/ভোটদাতা সকলকে আমরা ঢালাওভাবে কাফের ঘোষণা করি না- যেমনটা নব্য খাওয়ারেজদের অনেকে করে থাকে। কারণ অধিকাংশ ভোটদাতাই গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞ। এজন্য সংসদীয় নির্বাচনে ভোট দেয়া কুফরী কাজ হওয়া সত্ত্বেও আমরা সাধারণভাবে ভোটদাতা সকলকে তাকফীর করি না।

সুতরাং কাউকে কাফির ঘোষণার ক্ষেত্রে **হক্কানী উলামায়ে কেরামই** কেবল ফয়সালা দেয়ার অধিকার রাখেন। সাধারণ মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হল- হুটহাট করে কাউকে তাকফীর করা হতে বিরত থাকা, উলামায়ে কেরামের আনুগত্য করা এবং ঈমান বিধ্বংসী কর্মসমূহকে বুঝে ও চিনে তা থেকে বিরত থাকা।]

উপরে বর্ণিত দশটি পয়েন্টকে ‘নাওয়াক্বিযুল ঈমান’ (نواقض الأيمان) তথা ঈমান ভঙ্গকারী কর্ম বলা হয়। এগুলো কুফরে আকবার (বড় কুফর) বা কুফরে বাওয়াহ্ (সুস্পষ্ট কুফর)। এগুলোর যে কোন একটিতে লিপ্ত হলে ব্যক্তির ঈমান নষ্ট হয়ে যায়; সে ইসলামের গণ্ডি হতে বের হয়ে যায়।

"কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত কাফের হবে না, যতক্ষণ না সে তার অন্তর দিয়ে অস্বীকার করে"- এই কথাটি নব-উদ্ভাবিত একটি বিদআত।

যুগের মুরজিয়া ও জাহ্মিয়া ফেরকার আকীদা থেকে আমরা নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করছি, যারা বিশ্বাস করে- "কুফর শুধু অন্তর দিয়ে প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মাঝেই সীমাবদ্ধ; অন্তরে আকীদা-বিশ্বাস দুরস্ত থাকলে কথা-কাজের দ্বারা কখনও কাফের হয় না।"

আমরা বলি, আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতে এমন কিছু কথা ও কাজ আছে, তা যদি কোন মুসলিম বলে বা করে, তাহলে সে কথা ও কাজ তাকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দেয়- যদিও তার অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমান বিদ্যমান থাকে। যেমনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নিয়ে কটূক্তি করা, শরীয়তের কোন বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা ইত্যাদি।

তাছাড়া, তাকফীরের ক্ষেত্রে আমরা খারেজীদের মাযহাবকেও প্রত্যাখ্যান করি, যারা কবীরা গুনাহের কারণে মুসলিমদেরকে তাকফীর করে। কোন মুসলমানকে আমরা কবীরা গুনাহের কারণে তাকফীর করি না, যতক্ষণ না সে গুনাহ্‌টিকে হালাল সাব্যস্ত করে অথবা তার থেকে ঈমান ভঙ্গের অন্য কোনো কারণ প্রকাশ পায়।

বরং, তাকফীরের ক্ষেত্রে আমরা চরমপন্থা (إفراط) ও শিথীলতা (تفريط) উভয়টিকে পরিত্যাগ করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করি।

প্রিয় ভাই! আশাকরি, আমরা এতক্ষণে বুঝে গিয়েছি, কেমন করে ব্যাপকভাবে কুফুরি আকীদা ও কর্মকাণ্ড আমাদের সমাজে দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের নিজেদের এবং চারপাশের লোকগুলোর দিকে তাকালেই আমরা প্রিয় নবীজী ﷺ এর হাদীসের মর্ম ও সত্যতা ভালোভাবে বুঝতে পারব। সত্যিই, বর্তমান যামানাই সেই যামানা যখন ঈমান ধরে রাখা হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার ধরে রাখার চেয়েও কঠিন হয়ে গিয়েছে।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলের ঈমানকে হেফাযত করুন। আমীন।

[বি.দ্রঃ আক্বীদার বিষয়গুলো আরো স্পষ্ট করে বুঝার জন্য আমাদের নিম্নের কিতাবগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করা উচিত।

কিতাবের লিংক: (অবশ্যই Tor Browser দিয়ে সার্চ করুন:)

১. তাওহীদের কালিমা-শাইখ হারেস আন নায্যারী রহ.:
https://archive.org/details/20220820_20220820_1135

২. নেদায়ে তাওহীদ-শাইখ আবু উমার আল মুহাজির:
https://archive.org/details/20220820_20220820_1139

৩. তাকফীরের ব্যাপারে সতর্ক হোন- শাইখ আবু হামজা আল মিশরী:
https://archive.org/details/20220827_20220827_0234

অথবা নিচের QR Code-টি স্ক্যান করে অবশ্যই Tor Browser দিয়ে সার্চ করুন:

তাওহীদের কালিমা

নেদায়ে তাওহীদ
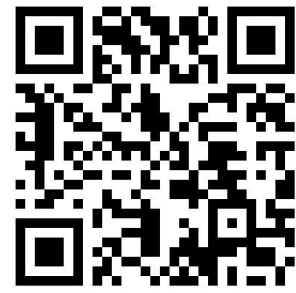
তাকফীরের ব্যাপারে সতর্ক হোন

ঈমান আনার পর প্রথম ফরয

শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর লিখিত "মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা" কিতাবে লিখেন, "ঈমান আনার পর প্রথম ফরয হচ্ছে, মুসলিমদের ভূমিকে প্রতিরক্ষা করা। যদি মুসলিমদের ভূমির এক বিঘত পরিমাণের জায়গাও কুফ্ফাররা দখল করে নেয়, তখন প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় (সবার উপর ফরয হয়ে যায়)। ঐ মুহূর্তে জিহাদে বের হওয়ার জন্য পিতা-মাতার কাছ থেকে তার সন্তানের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না এবং স্বামীর কাছ থেকে তার স্ত্রীরও অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।"

["মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা" কিতারের লিংক:

(অবশ্যই Tor Browser দিয়ে সার্চ করুন:)

https://archive.org/details/20220820_20220820_1144

অথবা, পাশের QR Code-টি স্ক্যান করে অবশ্যই Tor Browser দিয়ে সার্চ করুন।]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه،

"যে আগ্রাসী শক্তি মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়া ধ্বংস করে, ঈমানের পর তাকে প্রতিরোধের চেয়ে গুরুতর ফরয দ্বিতীয় আরেকটি নেই।" (ফাতাওয়া আল কুবরা, খ. ৪, পৃ. ৬০৮)

ঠিক এজন্যই আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসার সাথে সাথে জিহাদকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার কথা বলেছেন।

যেমন: আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ٢٤

"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা (ক্ষতি বা) বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর, এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহ্‌র বিধান আসা পর্যন্ত (দেখ, তোমাদের পরিণতি কি হতে যাচ্ছে), আর আল্লাহ তা'আলা ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" (০৯ সূরা তাওবাহ: ২৪)

জিহাদ একটি ফরয আমল:

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢١٦

"তোমাদের উপর যুদ্ধ **ফরয** করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। হতে পারে একটা বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দীয়, অথচ তোমাদের জন্য তা অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলাই জানেন, তোমরা জান না।" (২ সূরা বাকারা: ২১৬)

✓ আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন,

وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ۚ

"আর তোমরা তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করতে থাকো, যে পর্যন্ত না (পৃথিবীর সকল) ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" (৮ সূরা আনফাল: ৩৯)

যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে একজন কাফেরও অবশিষ্ট থাকবে, কিংবা এক বিঘত ভূমিও ইসলামী শাসনের বাহিরে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে ফেতনা অবশিষ্ট থাকবে, যার কারণে কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ একটি ফরয হুকুম হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে।

জিহাদের মূল লক্ষ্য হল:-

১. তাওহীদের পতাকা সমুন্নত করা, কুফরের পতাকা অবনত করা।
২. পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত করা।
৩. ইসলামি খিলাফাহ্ 'আলা-মিনহাজিন্ নুবুওয়্যাহ ফিরিয়ে এনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা।

মুসলিম সাম্রাজ্যের বা খিলাফতের কোন নির্দিষ্ট বর্ডার বা সীমানা নেই, সবটাই ফ্রন্টলাইন বা যুদ্ধক্ষেত্র। ততদিন পর্যন্ত জিহাদ চলবে যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর এক ইঞ্চি মাটিও আল্লাহ তা'আলার বিধান প্রতিষ্ঠা থেকে খালি থাকবে এবং একজন মানুষও আল্লাহর দ্বীনের আওতার বহির্ভূত থাকবে। কোন ইনসাফকারীর ইনসাফ অথবা কোনো জালিমের জুলুম এই জিহাদকে বন্ধ করতে পারবে না। কেয়ামত পর্যন্ত সর্বদাই একটি হক্ব জামাত হক্বের উপর জিহাদ চালিয়ে যাবে।

জিহাদের প্রকারভেদ

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দুই কারণে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা তোমাদের উপর ফরয-
ক. আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করা। (ইক্বদামী বা আক্রমনাত্মক বা Offensive জিহাদ)
খ. কাফেরদের হাতে নির্যাতিত মুসলমানদের মুক্ত করা। (দেফায়ী বা প্রতিরক্ষামূলক বা আত্মরক্ষামূলক বা প্রতিরোধমূলক বা Defensive জিহাদ) (তাফসীরে উসমানী, পৃ. ২৪৪)

জিহাদ কখন ফরযে কিফায়া?

প্রিয় ভাই! সহজভাবে বুঝার চেষ্টা করি-

যখন পৃথিবীতে ইসলামী খিলাফাহ্ কায়েম থাকে এবং সাধারণভাবে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিতরে এবং বাহিরে মুসলমানদের শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করে তখন জিহাদ ফরযে কিফায়া থাকে, অর্থাৎ উম্মতের কিছু মানুষ জিহাদ করলে সকলের পক্ষে জিহাদ আদায় হয়ে যায়।

এমতাবস্থায় মুসলিম জাহানের যিনি খলীফা, তিনি আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য পার্শ্ববর্তী কোনো কুফর রাষ্ট্রে অভিযান পরিচালনা করবেন। এ জিহাদের মাধ্যমে কোনো কুফর রাষ্ট্রকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়, তা কবুল না করলে ‘জিযিয়া কর’ দাবী করা হয়, যদি এতে তারা সম্মত হয় তবে তাদের নিরাপত্তার ভার মুসলিমদের হাতে। মুসলমানরা নিজের রক্ত দিয়ে সেসকল অমুসলিমদের জান ও মালের হেফাযত করবে, বহিঃশত্রু থেকে তাদের রক্ষা করবে। আর কোনো অমুসলিম সম্প্রদায় কর দিতে সম্মত না হলে তরবারি (তথা যুদ্ধ) দ্বারা ফয়সালা করা হয়, যারা তরবারি দ্বারা মুজাহিদদের পথ রোধ করবে সেসব সৈন্যদেরকে হত্যা বা বন্দী করা হয়, তাদের নারীদেরকে দাসী-বাঁদী বানানো হয়। সেই ভূমি জয় করে তাতে আল্লাহর বিধান/আইন প্রতিষ্ঠা করা হয়, আর সামর্থ্যবান অমুসলিমদের কাছ থেকে কর আদায় করা হয়।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ

ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩

"তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের ঐ সকল লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।" (০৯ সূরা তাওবাহ: ২৯)

প্রিয় ভাই! যেহেতু এই যুদ্ধটি আগে বেড়ে আক্রমণ করা হয়, তাই এটি হলো ইক্বদামী বা আক্রমনাত্মক (Offensive) বা "আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করা"র জিহাদ। এই জিহাদ ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ কিছু মুসলমান এই দায়িত্ব আঞ্জাম দিলেই সকলের পক্ষ থেকে জিহাদের ফরযিয়াত (বাধ্যবাধকতা) আদায় হয়ে যাবে।

ইক্বদামী যুদ্ধের জন্য শর্তসমূহ

এই জিহাদের জন্য কিছু শর্ত আছে, যেমন-

১. মুসলমান হওয়া।

২. বুদ্ধিমান হওয়া।

৩. বালেগ/প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

৪. জিহাদের ব্যয়-ভার বহনে সক্ষম হওয়া।

৫. শারীরিকভাবে সক্ষম হওয়া।

৬. জিহাদ ফরযে কিফায়া অবস্থায় পিতা-মাতার অনুমতি অপরিহার্য।

৭. পিতা-মাতা না থাকলে দাদা-দাদীর অনুমতির প্রয়োজন হবে।

৮. ঋণী ব্যক্তিকে তার ঋণদাতার কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।

৯. মহিলাদের জন্য তার স্বামীর অনুমতি লাগবে। ইত্যাদি।

জিহাদ কখন ফরযে আইন হয়?

নিম্নের তিনটি ক্ষেত্রে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। যথা-

প্রথম ক্ষেত্র, খলীফা যখন কোনো অমুসলিম/তাগুত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন আর সাধারণভাবে সক্ষম সকলকে/নির্দিষ্ট লোকদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহনের আহ্বান জানান, তখন সক্ষম সকলের উপর/নির্দিষ্ট ঐসকল লোকদের উপর জিহাদে/যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ফরযে আইন হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র, যখন মুসলমানদের একটি দল কুফ্ফারদের সম্মুখীন হয় (যদিও তা ইক্বদামী হোক না কেন) তখন ঐ দলের উপর জিহাদ করা ফরযে আইন হয়ে যায়।

তৃতীয় ক্ষেত্র (দেফায়ী বা প্রতিরক্ষামূলক বা প্রতিরোধমূলক বা Defensive জিহাদ)**:**

পৃথিবীর বুকে ইসলামী খিলাফাহ থাক বা না থাক, মুসলমানদের আমীর থাক বা না থাক, এমতাবস্থায়-

১. যদি আগ্রাসী কোনো বাহিনী মুসলিম ভূমির দিকে কেবল অগ্রসর হয়,
২. যদি কোনো কাফের বাহিনী মুসলমানদের সীমানায় তাঁবু স্থাপন করে,
৩. কোন কাফের বাহিনী মুসলমানদের উপর হামলা করে বসে,
৪. মুসলিম ভূমির এক বিগত মাটিও যদি কুফ্ফাররা দখল করে নেয়,
৫. যদি পৃথিবীর কোথাও কোন একজন মুসলিমও কুফ্ফার কর্তৃক বন্দী হয়, ঐ মুসলমানকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত জিহাদ করতে সক্ষম প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরযে আইন হয়ে যায়।

উপর্যুক্ত ক্ষেত্রবিশেষগুলোতে জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার বিষয়টি সকল মাযহাবেই স্বীকৃত, এই ব্যাপারে কোনো মাযহাবের ইমাম, সালাফ কিংবা খালাফ, নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরাম, কারো কোনো দ্বিমত নেই।

দেখুন-

ফিক্‌হে হানাফীঃ

১. আল্লামা জাস্‌সাস (রহঃ) এর ফতওয়া: (আহকামুল কুরআন, খণ্ড:৪, পৃষ্ঠা:৩১২)

২. আল্লামা ইবনে আবেদীন আশ-শামী (রহঃ) এর ফতওয়া: (হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা:২৩৮)

৩. আল্লামা আবূ বকর আল-কাসানী (রহঃ) এর ফতওয়া: (বাদায়েউস সনায়ে, খণ্ড:১৫, পৃষ্ঠা:২৭১)

৪. আল্লামা ইবনু নুজাইম আল-মিসরী (রহঃ) এর ফতওয়া: (আল বাহরুর রায়েক, খণ্ড:১৩, পৃষ্ঠা:২৮৯, ২৯০)

৫. আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহঃ) এর ফতওয়া: (ফাতহুল কাদীর, অধ্যায়: কিতাবুস সিয়ার, খণ্ড:১২, পৃষ্ঠা:৩৪৮)

৬. আল্লামা মূসিলী (রহঃ) এর ফতওয়া: (কিতাবুল ইখতিয়ার, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:৪৬৯)

৭. ইমাম যা‘লায়ী (রহঃ) এর ফতওয়া: (তাবয়ীনুল হাকায়েক, খণ্ড:৯, পৃষ্ঠা:২৬৬)

ফিক্‌হে শাফি‘ঈঃ

১. আল্লামা রমালী (রহঃ) এর ফতওয়া: (নেহায়েতুল মুহতাজ, খণ্ড:৮, পৃষ্ঠা:৫৮)

২. ইমামুল হারামাইন (রহঃ) এর ফতওয়া: (গিয়াছাতুল উমাম, পৃষ্ঠা:১৯১)

৩. আল্লামা খতীব শারবিয়ানী (রহঃ) এর ফতওয়া: (একনা'য়, খণ্ড:২, পৃষ্ঠা:৫১০)
৪. আল্লামা মাওয়ারিদী (রহঃ) এর ফতওয়া: (আল-ইনসাফ, খণ্ড:৪, পৃষ্ঠা:১১৭)
৫. ইমাম নববী (রহঃ) এর ফতওয়া: (আল-মাজমূ'য়, খণ্ড:১৯, পৃষ্ঠা:২৬৯; রওযাতুত তলেবীন, খণ্ড:৪ পৃষ্ঠা:১)

ফিকহে মালিকী:

১. আল্লামা ইবনে আব্দিল বার (রহঃ) এর ফতওয়া: (আল-কাফী ফী ফিকহে মদীনা, পৃষ্ঠা:৪৬৩)
২. ইমাম কুরতুবী (রহঃ) এর ফতওয়া: (তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড:৮, পৃষ্ঠা:১৫১)

ফিকহে হাম্বলী:

১. আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) এর ফতওয়া: (আল ফাতাওয়াল কুবরা, খণ্ড:৪, পৃষ্ঠা:৬০৮)
২. ইমাম ইবনে কুদামা (রহঃ) এর ফতওয়া: (মুগনী; খণ্ড:৮, পৃষ্ঠা:৩৪৫)

উম্মাহর অন্যান্য ফুকাহাগণের মতামত:

১. শায়েখ হাসানুল বান্না শহীদ (রহঃ) এর ফতওয়া: (দেখুন: শায়েখের রিসালাহ: আল-জিহাদ)
২. ইবনে আতিয়্যা (রহঃ) এর ফতওয়া: (তাফসীরে ইবনে আতিয়্যা, খণ্ড:৮, পৃষ্ঠা:৩৪৬)

জাহেরী ফুকাহাগণের ফতওয়া:

আল্লামা ইবনে হাযম (রহঃ) এর ফতওয়া: (মুহাল্লা, খণ্ড:, পৃষ্ঠা:২৯২, ৩০০, ৩৫১]

সমকালীন আরব আলেমগণের ফতওয়া:

১. হামূদ বিন উকলা আশ-শু'আইবী (রহঃ) এর ফতওয়া: (দেখুনঃ http://www.tawhed.ws/r1?i=6126&x=3nh5yxxk)

২. শায়েখ সুলাইমান আল-উলওয়ান (দাঃ বাঃ) এর ফতওয়া: (শরহু কিতাবিস সিয়াম মিন সুনানিত তিরমিজী লিল-আলওয়ান-২১৯)

৩. শায়েখ সলেহ আল মুনাজ্জিদ (রহঃ) এর ফতওয়া: (দেখুনঃ www.islam-qa.com ফাতাওয়াল ইসলাম ওয়া সুয়াল জওয়াব, সুয়াল নাম্বার-৩৪৮৩০)

মুজাহিদীন আলেমগণের ফতওয়া:

১. শহীদে উম্মত আব্দুল্লাহ আয্‌যাম (রহঃ) এর ফতওয়া: (আদ-দিফা আন আরাদিয়াল মুসলিমীন আহাম্মু ফুরূজিল আ'ইয়ান)

২. শায়েখ শহীদ আবু ইয়াহইয়া আল-লিবী (রহঃ) এর ফতওয়া: (আল-জিহাদ ওয়া মা'রেকআতুস সুবহাত, পৃষ্ঠা:৩৫)

............ইত্যাদি।

বর্তমানে যে জিহাদ আমাদের সকলের উপর ফরযে আইন

প্রিয় ভাই!

দেফায়ী বা প্রতিরক্ষামূলক বা প্রতিরোধমূলক বা Defensive জিহাদের ক্ষেত্রে আর কারো ঘরে বসে থাকার উপায় থাকে না। সক্ষম সকল মুসলমানের উপর জিহাদ করা ফরযে আইন হয়ে যায়।

- **'নফীরে আম':**

এই পরিস্থিতিকে ফিক্হের ভাষায় 'নফীরে আম' বলা হয়। 'নাফীর' অর্থ 'যুদ্ধে বের হওয়া।' আর 'আম' অর্থ ব্যাপক। নফীরে আম দ্বারা উদ্দেশ্য এমন অবস্থা, যখন শত্রুকে প্রতিহত করতে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের সকলের জিহাদে বের হওয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়, জিহাদের জন্য কারো কাছ থেকে অনুমতির প্রয়োজন নেই। সন্তানের জন্য পিতার কাছ থেকে, স্ত্রীর জন্য স্বামীর কাছ থেকে, ঋণগ্রহীতার জন্য ঋণদাতার কাছ থেকে, গোলাম তার মনিব থেকে, এমনকি 'নফীরে আম' অবস্থায় মুসলিম আমীরের অনুমতিরও দরকার নেই, জিহাদের জন্য বের হওয়ার ব্যাপারে তার কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞাও মান্য করা যাবে না। কেননা এমতবস্থায় কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা আল্লাহ্র হুকুমের খেলাফ, তাঁর নাফরমানীর শামিল। আর আল্লাহ্র নাফরমানী করে কারো আনুগত্য করার অনুমতি শরীয়তে নেই। পবিত্র হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ইরশাদ করেন-

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - المصنف لابن أبي شيبة: ٣٤٤٠٦

"খালেকের নাফরমানী করে বান্দার আনুগত্য করা যাবে না।" (শরহুস্ সিয়ারিল কাবির: ২/৩৭৮)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ١٩٠ وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ

"আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্গনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে পাও সেখানেই, আর তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করে দিয়েছে তোমাদেরকে। বস্তুতঃ ফেতনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ।" (০২ সূরা আল বাকারা: ১৯০-১৯১)

وَقَٰتِلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمۡ كَآفَّةًۚ

"আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে।" (০৯সূরা আত্-তাওবাহ: ৩৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন,

وَمَا لَكُمۡ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلۡوِلۡدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا مِنۡ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهۡلُهَا وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّٗا وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٥

"আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার

অধিবাসীরা যে যালেম, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।" (৪ সূরা নিসা: ৭৫)

• উলামায়ে কেরামের ফাতওয়া:

✓(হানাফী) আল্লামা জাস্সাস (রহঃ) এর ফতওয়া:

ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو، ولم تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، وهذا لاخلاف فيه بين الأمة إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين و سبي ذراريهم (أحكام القرآن : ৪ /৩১২).

"সকল মুসলমানদের প্রসিদ্ধ আকীদা হলো, যখন সীমান্তবর্তী মুসলমানেরা শত্রুর আশংকা করবে, আর তাদের মাঝে শত্রু প্রতিরোধের ক্ষমতা বিদ্যমান না থাকবে, তারা নিজ পরিবার-পরিজন, দেশ ও জানের ব্যাপারে শংকাগ্রস্থ হবে, এমতাবস্থায় পুরো উম্মাহর উপর ফরজ হয়ে যায়, যে ব্যক্তিই শত্রুদের ক্ষতি থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম সে জিহাদে বের হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে উম্মাহর মাঝে কোনো দ্বিমত বিদ্যমান নেই। কেননা তাদেরকে সাহায্য না করে বসে থাকা বৈধ, এটা কোন মুসলমানের কথা হতে পারে না, যখন নাকি শত্রুরা মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করছে ও তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দী করছে। (আহকামুল কুরআন, খন্ড:৪,পৃষ্ঠা:৩১২)

✓(হানাফী) আল্লামা ইবনে আবেদীন আশ-শামী (রহঃ) এর ফতওয়া:

وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلواولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج-- حاشية ابن عابدين (৩/২৩৮)

"যদি শত্রুরা মুসলমানদের কোনো সীমানায় আক্রমণ চালায়, তাহলে তার নিকটবর্তী যুদ্ধে সক্ষম মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। যদি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন না হয়, তাহলে আক্রান্ত এলাকা থেকে যারা দূরে অবস্থান করছে তাদের উপর জিহাদ ফরজে কেফায়া। তবে শত্রুর নিকটে যারা রয়েছে তারা যদি শত্রুকে প্রতিরোধ করতে অপারগ হয়, অথবা অপারগ না হয় কিন্তু অলসতাবশত জিহাদ ত্যাগ করে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর নামাজ ও রোজার ন্যায় জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়, যা ছেড়ে দেয়া বৈধ নয়। এভাবে ক্রমানুসারে পূর্ব পশ্চিমের সকল মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। (হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:২৩৮)

✓(মালিকী) ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, "(হাম্বলী) ইবনে আতিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين،

إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينءذ فرض عين. اهـ- تفسير ابن عطيه: ١/٢٨٩

"একথার উপর ইজমা চলে আসছে যে, উম্মতে মুহাম্মাদির প্রতিটি ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরযে কিফায়া। যদি মুসলমানদের একাংশ তা আদায় করে, অন্যদের থেকে এর দায়িত্ব-ভার সরে যাবে। তবে শত্রু যদি কোনো ইসলামী ভূ-খন্ডে আগ্রাসন চালায়, তখন তা ফরযে আইন হয়ে যায়।" (তাফসীরে ইবনে আতিয়্যাহ ১/২৮৯; তাফসীরে কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ৩৮)

✓(হাম্বলী) শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصاءل عن الحرمة والدين واجب إجماعا، فالعدو الصاءل الذي يفسد الذين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم. اهـ- الفتوى الكبير ٤/٦٠٧

"দেফায়ী বা প্রতিরোধমূলক (Defensive) যুদ্ধ মুসলমানদের দ্বীন ও সম্মানের উপর আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর, যা সর্বসম্মতিক্রমে ফরয (ফরযে আইন)। যে আগ্রাসী শক্তি মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়া ধ্বংস করে, ঈমানের পর তাকে প্রতিরোধের চেয়ে গুরুতর ফরয দ্বিতীয় আরেকটি নেই। এই ক্ষেত্রে কোনো শর্ত প্রযোজ্য নয়, বরং সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ করতে হবে। আমাদের ও অন্যান্য (মাযহাবের) ফুকাহায়ে কেরাম সকলেই তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।" (ফাতাওয়া আল কুবরা, খ. ৪, পৃ. ৬০৮)

✓(শাফে'ঈ) আল্লামা রমালী রহ. বলেন,

فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم، من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة

"যদি শত্রুরা আমাদের কোনো এলাকায় প্রবেশ করে, আর আমাদের মাঝে ও তাদের মাঝে সফরের দূরত্বের চেয়েও কম দূরত্ব থাকে, তাহলে ঐ দেশের অধিবাসীদের উপর প্রতিরোধ করা ফরজ হয়ে যায়। এমনকি ঐ ব্যক্তিদের উপরও ফরয হয়ে যায় যাদের উপর জিহাদ নেই। যেমন: দরিদ্র, নাবালেগ, গোলাম, ঋণগ্রহীতা, মহিলা।" (নেহায়েতুল মুহতাজ, খণ্ড:৮, পৃ. ৫৮)

✓ (হানাফী) "আর যখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে ....সন্তানের জন্য তার অভিভাবক থেকে, গোলাম তার মনিব থেকে, স্ত্রী তার স্বামী থেকে এবং ঋণগ্রহণকারী ঋণদাতা থেকে জিহাদের অনুমতির প্রয়োজন হয় না।" [ফাযায়েলে জিহাদ, সগীর বিন এমদাদ, পৃ. ৫১২; মাসায়েলে জিহাদ অধ্যায়, মাসআলা নং-৯]

✓ (হানাফী) মুফতী শফী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এমনিভাবে আল্লাহ না করুন, কখনো যদি কাফেররা কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে আক্রমণ করে এবং প্রতিরোধের জন্য নির্ধারিত বাহিনী তাদের প্রতিরোধে যথেষ্ট না হয়, তখন উক্ত ফরয তাদের অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী সকল মুসলমানের উপর আরোপিত হয়। তারাও যদি সক্ষম না হয়, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর এবং এভাবে ক্রমান্বয়ে সমগ্র বিশ্বের প্রত্যেক মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় (যখন কুফ্ফারদের কোনো আগ্রাসন থাকে না, তখন) জিহাদ ফরযে কিফায়া।" (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, খ. ৪, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬, রদ্দুল মুহতার, খ.৩, পৃ. ২৩৮)

✓(শাইখুল জিহাদ) হযরত আব্দুল্লাহ্ আয্যাম রাহি. বলেন,

ففي هذه الحالة اتفق السلف والخلف والفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الإسلامية إطلاقا أن الجهاد

في هذه الحالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلدة التي هاجمها الكفار وعلى من قرب منهم.....

"যদি কাফেররা মুসলিমদের ভূমিতে প্রবেশ করে তাহলে সলফে সালেহীনগণ, তাদের উত্তরসূরীগণ, চার মাযহাবের আলেমগণ (হানাফী, মালেকী, শাফেঈ, হাম্বলী), মুহাদ্দীসগণ এবং মুফাস্‌সীরগণ এবং ইসলামের ইতিহাসের সর্বকালের, সর্বমতের আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, এই অবস্থায় জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। ফরযে আইন ঐ সকল মুসলিমদের উপর যাদের ভূমি কাফেররা আক্রমন করেছে অথবা যারা আক্রান্ত মুসলিম ভূমির কাছাকাছি রয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সন্তানকে তার পিতা-মাতার কাছ থেকে, স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছ থেকে, দাসকে তার মনিবের কাছ থেকে এবং দেনাদারকে তার পাওনাদারের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। যদি ঐ আক্রান্ত অঞ্চলের মুসলিমরা সৈন্যের ঘাটতির কারণে অথবা অক্ষমতা কিংবা গাফলতির কারণে কাফেরদেরকে তাদের ভূমি হতে বিতাড়িত করতে না পারে তখন এই ফরযে আইনের হুকুমটি ঐ আক্রান্ত ভূমির নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর বর্তাবে, যদি তারাও সক্ষম না হয় তাহলে তার নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর প্রযোজ্য হবে। আর যদি তাদেরও গাফলতি অথবা জনশক্তির ঘাটতি থাকে তাহলে পরবর্তীতে তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলিমদের উপর এই হুকুমটি বর্তাতে থাকে; যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ঘাটতি পূরণ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটি চলতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে এটি পুরো দুনিয়ার মুসলিমদের উপর ফরযে আইন হয়ে যাবে।" (আদ্দিফা' আ'ন আ'রাদিল মুসলিমীন, পৃ:২৭)

✓(হানাফী) আল্লামা ইবনু নুজাইম আল-মিসরী রহ. বলেন,

امرأة مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من الاسر

"যদি প্রাচ্যের মধ্যে একজন মুসলিম মহিলা কারাগারে বন্দী থাকেন, তাহলে পাশ্চাত্যবাসীর উপর ওয়াজিব হবে তাকে বন্দীত্ব থেকে মুক্তি করা।" (আল-বাহরুর রায়েক, খণ্ড:১৩, পৃ. ২৯০)

✓(শাফে'ঈ) ইমামুল হারামাইন রহ. বলেন,

فأما إذا وطئ الكفار ديار الإسلام فقد اتفق حملة الشريعة قاطبة على أنه يتعين على المسلمين أن يخفوا ويطيروا إلى مدافعتهم زرافات و وحدانا حتى انتهوا إلى أن العبيد ينسلون عن ربقة طاعة السادة، ويبادرون الجهاد على الاستبداد، وإذا كان هذا دين الأمة ومذهب الأئمة فأي مقدار الأموال في هجوم أمثال هذه الاهوال لو مست إليها الحاجة وأموال الدنيا لو قوبلت بقطرة دم لم تعد لها ولم توازها

"ইসলামী শরীয়ার সকল কর্ণধারগণ একমত পোষণ করেছেন যে, যদি কাফেররা কোনো ইসলামী ভূখণ্ডে অবতরণ করে তখন সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব হয়ে যায় যে, তারা দ্রুতবেগে, ক্ষিপ্র গতিতে একাকী বা দলবদ্ধভাবে শত্রু প্রতিরোধে বের হয়ে পড়বে। এমনকি তারা এ মতে উপনীত হয়েছেন যে, গোলামরা তাদের মালিকের আনুগত্য মুক্ত হয়ে যাবে এবং সকলে স্ব-উদ্যোগে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে। যখন এটাই উম্মাহর দ্বীন, আইম্মাদের মাযহাব তখন প্রশ্ন আসে, এ ধরনের ভয়ঙ্কর আক্রমণের ক্ষেত্রে কী পরিমাণ মাল ব্যবহার করতে হবে? (এর জবাব হল) যদি একফোঁটা রক্ত রক্ষার জন্য পৃথিবীর সকল অর্থ ব্যয় করতে হয় তাহলে এ

রক্ত ফোঁটার সামনে সকল অর্থ নগণ্য ও তুচ্ছ বলে পরিগণিত হবে।"
(গিয়াছাতুল উমাম, পৃ. ১৯১)

✓হযরত আব্দুল্লাহ্ আয্যাম রাহি. আরো বলেন,

ولذلك الجهاد فرض عين الآن على الأمة الإسلامية جمعاء، ليس من الآن، بل من يوم سقطت الأندلس، من 1492 ميلادي، قبل خمس قرون صار فرض عين، وخلال خمس قرون الأمة كلها آثمة، لأنها لم ترجع الأندلس، الآن الجهاد فرض عين، ولا ينتهي بتحرير أفغانستان، ولا بتحرير فلسطين، ينتهي فرض العين عندما نرجع كل بقعة، كانت في يوم من الأيام تحت راية لا إله إلا الله، فالجهاد فرض عين عليك حتى تموت، كما أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان إلا إذا مات فالجهاد لا يسقط على الإنسان إلا إذا مات أبدا، احمل سيفك وامض في الأرض، لا ينتهي فرض العين أبدا حتى تلقى الله، وكما أنه لا يجوز أن تقول صمت العام الماضي هذه السنة أريد أن أستريح، أو صليت الجمعة الماضية وهذه الجمعة أريد أن أستريح، كذلك لا يجوز أن تقول جاهدت السنة الماضية وهذه السنة أريد أن أستريح.

".......এ কারণেই জিহাদ গোটা মুসলিম উম্মাহর উপর ফরযে আইন হয়ে আছে। আর তা কেবল এখন থেকে নয় বরং যেদিন ইসলামী আন্দালুস তথা স্পেনের পতন ঘটেছে, সেই ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ তথা আজ থেকে পাঁচ শতাব্দী ধরে ফরযে আইন হয়ে আছে। আর গোটা এই পাঁচশত বছর যাবত মুসলিম উম্মাহ সামগ্রিকভাবে গুনাহগার হয়ে আছে কারণ আন্দালুস এখনো পুনরুদ্ধার হয়নি।

আজ যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে আছে তখন তা কেবল আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিন স্বাধীন হবার মাধ্যমেই আমাদেরকে দায়িত্বমুক্ত করবে না। বরং ফরজ দায়িত্ব তখনই পুরোপুরি পালিত হবে যখন এমন প্রতিটি ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার হয়ে যাবে, একদিনের জন্য হলেও যেখানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র পতাকা উচ্চকিত ছিল।

অতএব আপনার উপর জিহাদ ফরয থাকবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত, যেমনিভাবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষ নামাজের ফরজ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে না। অতএব মৃত্যু অবধি সকল মানুষের উপর জিহাদ ফরজে আইন। অতএব আপনি আপনার তরবারি হাতে নিন এবং জমিনের উপর বিচরণ করতে থাকুন। আল্লাহ্‌র সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ঘটবার আগ পর্যন্ত এই ফরজে আইন দায়িত্ব শেষ হবে না।

আর যেমনিভাবে কারো জন্য এ কথা বলা জায়েজ নেই যে, আমি গত বছরের সিয়াম পালন করেছি, তাই এ বছর আমি বিশ্রাম নিতে চাই অথবা আমি গত সপ্তাহের জুমার সালাত আদায় করেছি অতএব এই সপ্তাহে আমি বিশ্রাম নিতে চাই। একই ভাবে এ কথা বলাও জায়েজ হবে না যে, আমি গত বছর জিহাদ করেছি তাই এ বৎসর আমি বিশ্রাম নিতে চাই।" (نصيحة الأمة الموحدة بحقيقة الأمم المتحدة : শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ, পৃ. ১৬, ১৭)

প্রিয় ভাই!

উপরের আলোচনা হতে কি আমরা এটাই বুঝতে পারছি না যে, বর্তমান যামানাই সেই যামানা, যখন পৃথিবীর প্রতিটি সক্ষম মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে?

সারা পৃথিবী জুড়ে আজ মুসলমানরা কুফ্‌ফার কর্তৃক আক্রান্ত। যেই সকল মর্দে মুজাহিদ জিহাদ করছেন, তারা এই সকল কুফ্‌ফারদের প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। কারণ হচ্ছে- মুজাহিদদের সংখ্যার অপ্রতুলতা, শক্তি সামর্থ্যের ঘাটতি, অন্যদিকে ক্রুসেডাররা মুসলিম মুজাহিদদের থেকে সংখ্যায় অনেক বেশি, তারা অনেক বেশি সশস্ত্র, তাদের অস্ত্রগুলো অনেক বেশি উন্নত ও আধুনিকতাসম্পন্ন। এক কথায়, বর্তমানে পৃথিবীতে যেখানে

যেখানে মুজাহিদ বাহিনী আছে, তা কুফ্ফারদের প্রতিরোধের জন্য যথেষ্ট নয়।

এসকল কারণে, এই ফরজ হুকুম বিশ্বের অপরাপর সকল মুসলমানের উপর বর্তিয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না কুফ্ফারদের আগ্রাসন বন্ধ হবে, মুসলিম ভূমিগুলো কুফ্ফারদের হাত হতে মুক্ত না করা হবে, কুফ্ফারদের কারাগার হতে শেষ ভাইটি কিংবা শেষ বোনটি মুক্ত হবে, মুসলিম দেশগুলোতে মুরতাদ সরকারগুলোকে হটানো হবে, সারা বিশ্বের সকল মুসলমানদের জন্য নিরাপদ আবাস, একক রাষ্ট্র, ইসলামী খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, সারা পৃথিবীর মুসলমান পুনরায় শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো মুসলমান এই ফরয হুকুম থেকে বাঁচতে পারবে না।

"যখন মুসলমানদের পক্ষ থেকে শত্রু প্রতিরোধের প্রয়োজন তীব্র হয়, তখন নিঃসন্দেহে জিহাদ সকল ইবাদত থেকে উত্তম। যেমন খন্দকের যুদ্ধে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চার ওয়াক্ত নামায কাযা হওয়ার ঘটনা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার।" (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, খ.৪, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬)

মুহতারাম ভাই!

তাহলে আমরা একটু চিন্তা করি, জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় যদি জিহাদ করতে গিয়ে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে আমরা কী করছি? আমরা জিহাদকে কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছি??

বর্তমান সময়ে, মুসলিম উম্মাহ্র এই ক্রান্তিলগ্নে, জিহাদ বাদ দিয়ে কেবল আমরা যদি মাদরাসা, খানকাহ, তাবলীগ, রাজনীতি, কিতাবাদি রচনা, চাকুরী,

ব্যবসা ইত্যাদি অন্যান্য দ্বীনী খেদমত কিংবা দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত থাকি, তাহলে জিহাদ করবে কে ভাই???

প্রিয় ভাই! আমি যেই মেহনতই করি না কেন, আমার মেহনতের পাশাপাশি আমাকে যেভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হয়, ঠিক তেমনিভাবে জিহাদও করতে হবে, ইনশাআল্লাহ।

আমরা যদি বর্তমান যুগে জিহাদকে শুধু এর শাব্দিক অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চাই, কিংবা কলমের জিহাদ, পিতা-মাতার খেদমত কিংবা মাদরাসায় দরস্ দেয়ার মাধ্যমে, নফসের ইসলাহ করা, গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ইত্যাদি কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে যদি মনে করি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র ফরজিয়াত আদায় হয়ে যাবে, তাহলে আমাদের জন্য এটি হবে মারাত্মক ভুল ও ভয়ানক আত্মঘাতী একটি সিদ্ধান্ত!!!

আচ্ছা ভাই! আপনি কি খাইরুল কুরুন ও পরবর্তী সলফে সালেহীনদের যুগে এই সকল চিন্তা চেতনা খুঁজে পেয়েছেন??

হাদীসশাস্ত্র কিংবা ফিক্‌হের কোনো কিতাবে 'কিতাবুল জিহাদে' কি ইলমী খেদমত, তাযকিয়া, সিয়াসাত (রাজনীতি) কিংবা দাওয়াতের ফাযায়েল বা মাসায়েল বর্ণনা করা হয়েছে, নাকি ক্বিতাল তথা সশস্ত্র যুদ্ধের ফাযায়েল বর্ণিত হয়েছে??

হাদীসশাস্ত্র কিংবা ফিক্‌হের কোন্ কিতাবে 'কিতাবুল জিহাদে' সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া জিহাদের ভিন্ন অর্থ করা হয়েছে???

তাহলে ভাই, কেন আমরা জিহাদের 'ভিন্নার্থ' তালাশ করে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছি??? অথচ নবীওয়ালা মেজাজ (প্রকৃত দ্বীন) কি এটাই ছিল না যে, জিহাদের প্রয়োজনে একান্ত অপারগতায় নামায ছুটে যেতে পারে, কিন্তু জিহাদের ব্যাপারে কোনো গাফলতী চলবে না??? কেননা নামায যে শরীয়তের বিধান, খোদ সেই শরীয়ত এবং পাশাপাশি গোটা উম্মতের অস্তিত্ব নির্ভর করে এই জিহাদের উপর। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْۖ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের (আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধের) প্রতি আহ্বান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। (সূরা আল আনফাল ৮:২৪)

কুফরের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ

প্রিয় ভাই! আপনি জানেন কি, কুফরের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ কী? (জাহেরী ফকীহ) আল্লামা ইবনে হাজাম রহ. বলেন,

ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار، وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم

"কুফরের পর সবচেয়ে জঘন্য গোনাহ হল, মুসলিমদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে নিষেধ করা এবং মুসলিমদের পবিত্র স্থানকে তাদের কাছে অর্পণ করতে আদেশ করা।" (মুহাল্লা, খণ্ড:৭, পৃ. ৩০০)

(فإن هجم العدو) أي غلب (ففرض عين) يكفر جاحده ، كما في الإختيار وغيره. اهـ- الدر المنتقي :٢/ ٤٠٨

'অকস্মাৎ শত্রু আগ্রাসন চালালে জিহাদ ফরযে আইন।'- এটা অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যাবে। যেমনটি ইখতিয়ার ও অন্যান্য কিতাবে আছে। (আদ্দুররুল মুনতাক্বা: ২/৪০৮)

একাকী হলেও জিহাদ করতে হবে

প্রিয় ভাই!

আমরা আরো ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করি, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে, জিহাদ এমন ভাবে ফরয হয়ে গিয়েছে যে, যদি জিহাদ করার মতো একজন উম্মতও থাকে, তবে তাকেও জিহাদ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفۡسَكَۚ

"(হে নবী!) আপনি (একা হলেও) আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুন; আপনার আপন সত্ত্বা ব্যতীত অন্য কারো দায় আপনার উপর বর্তাবে না (আপনার ডাকে অন্য কেউ যদি যুদ্ধ না করে তাহলে এজন্য আপনি দায়ী নন)।" (৪ সূরা নিসা: ৮৪)

ইবনে আতিয়্যাহ আন্দালুসি রাহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন,

هذا أمر في ظاهر اللفظ للنبي عليه السلام وحده، لكن لم نجد قط في خبر أن القتال فرض على النبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة مدة ما، المعنى- والله أعلم- أنه خطاب للنبي عليه السلام في اللفظ، وهو مثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه، أي أنت يا محمد وكل واحد من أمتك القول له فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يستشعر أن يجاهد ولو وحده،

[ابن عطية, تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ,86/2]

"বাহ্যত দেখা যায়, এ আয়াতের আদেশ শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একার জন্য। তবে কোনো হাদীসেই আমরা এ কথা পাইনি যে, কোনো যামানায় জিহাদ উম্মত বাদে শুধু রাসূলের উপর ফরয ছিল। (কাজেই) ওয়াল্লাহু আ'লাম- (আয়াতে) বাহ্যত রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করা হলেও এটি পৃথক পৃথক সকলকে বলাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! আপনি এবং আপনার উম্মতের সকলের প্রতিই নির্দেশ হলো, "তুমি (একা হলেও) আল্লাহর রাস্তায় ক্বিতাল (যুদ্ধ) কর। তোমার উপর তোমার নিজের ছাড়া অন্য কারো দায়ভার বর্তাবে না।"

এজন্য প্রতিটি মুমিনের এই অনুভূতি রাখা উচিত যে, সে একা হলেও জিহাদ করবে।

একই অর্থ বহন করছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণী,

والذي نفسي بيده، لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد

(হে সাহাবীরা! তোমরা যদি মূর্তি-পূজারী মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে ভয় পেয়ে থাক, তাহলে শুনে নাও!) যে সত্তার হাতে আমি মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর নামে শপথ করে বলছি, কেউ না গেলেও আমি একাই তাদের মোকাবেলার জন্য বদরে যাবো। (দ্বিতীয় বদরের যুদ্ধের ঘটনা, আল মাগাযি লিল ওয়াকিদি, ৩৮৭/১)

প্রিয় ভাই!

এখানে একটি প্রশ্ন রয়ে গেল, দেফায়ী বা প্রতিরক্ষামূলক বা প্রতিরোধমূলক" (Defensive) জিহাদের জন্য শর্ত কি?

ফিকাহ শাস্ত্রের সকল মাযহাবের সকল ইমামগণ এই ব্যাপারে একমত যে, দেফায়ী বা প্রতিরক্ষামূলক বা প্রতিরোধমূলক" (Defensive) জিহাদের ক্ষেত্রে (মা'জুর ব্যতীত সক্ষম সকলের জন্য) একমাত্র শর্ত হচ্ছে -ঈমান।

যে নিজেকে মুসলমান বা ঈমানদার দাবী করবে, তাকেই এই জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

আল্লামা ইবনু নুজাইম আল-মিসরী (রহঃ) বলেন:

ولا بد من قيد آخر وهو الاستطاعة في كونه فرض عين فخرج المريض المدنف، أما الذي يقدر على الخروج دون الدفع ينبغي أن يخرج لتكثير السواد لان فيه ارهابا،

"তবে ফরজে আইন হওয়ার ক্ষেত্রে (ঈমানের সাথে) আরেকটি শর্ত প্রয়োজন, আর তা হল সক্ষমতা। অন্যথায় কঠিন রুগ্ন ব্যক্তিকেও বের হয়ে পড়তে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু বের হতে সক্ষম প্রতিরোধ করতে নয়, তার জন্যও উচিৎ হলো সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বের হয়ে পড়া। কেননা এর মধ্যেও রয়েছে শত্রুদের জন্য ত্রাস। [আল বাহরুর রায়েক, খন্ড:১৩,পৃষ্ঠা:২৮৯]

এখন, দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, কতটুকু ঈমান অর্জন হলে বা একজন মুসলমানের ঈমান কতটুকু মজবুত হলে বা এক কথায় কতটুকু ঈমান থাকলে একজন মুসলমানের উপর দেফায়ী বা প্রতিরক্ষামূলক বা প্রতিরোধমূলক" (Defensive) জিহাদ ফরযে আইন হয়? বা কতটুকু ঈমান থাকলে দেফায়ী জিহাদের জন্য একজন মুমিনকে তার ঘর ছেড়ে বের হতে হবে? তার পরিবার পরিজন ছাড়তে হবে?

এই ব্যাপারেও ফুকাহায়ে কেরাম একমত যে, যতটুকু ঈমান অর্জন করলে একজন ব্যক্তির উপর নামায ফরয হয়, ততটুকু ঈমান হলেই তাকে জিহাদ করতে হবে। এককথায়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনলেই জিহাদ ফরযে আইন হবে।

• কিছু 'বাস্তব সত্য' কথা:

প্রিয় ভাই! উপরের আলোচনা থেকে আমরা কি বুঝতে পেরেছি-

বর্তমান যামানায় এই কথাগুলো বলার কোনো সুযোগ নেই,

১. আমরা এখন ঈমান বানানোর মেহনত করছি, আমাদের ঈমান মজবুত হলে বা ঈমান সেরকম (জিহাদ করার মত) হলে আমরা জিহাদ করব।

২. আমরা এখন ইখলাস অর্জন করার মেহনত করছি, ইখলাস অর্জিত হলে আমরা জিহাদে নামব।

৩. আমার এখনো ইসলাহ-ই হয়নি জিহাদ করব কিভাবে? আগে নফসের ইসলাহ, পরে জিহাদ।

৪. আমি তো নওমুসলিম/নওমুসলিমের মত; ইসলামের তেমন কিছু বুঝি না, এলেম-কালাম তেমন জানা নেই, তিলাওয়াতই সহীহ না, তাহলে যুদ্ধ/জিহাদ করব কিভাবে?

৫. আগে পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তানের হক আদায় করতে হবে, তিলাওয়াত সহীহ/ঠিক করতে হবে (এগুলো ফরয দায়িত্ব), পরে জিহাদ করব।

[জবাব: একাধিক ফরয দায়িত্ব একসাথে সামনে হাযির হলে যেটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটিকে প্রাধান্য দিতে হবে ও আগে আদায় করতে হবে। জিহাদের সাথে আরো অন্য ফরয একসাথে সামনে আসলে জিহাদকে প্রাধান্য দিতে হবে।]

৬. **খণ্ডিত ইসলামের দর্শন:** উসমানী খিলাফাহ্র পতনের পর মুসলিম সমাজ শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। যে যতটুকু পেরেছে ইসলামকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করেছে। এক পর্যায়ে যে যেটা করছেন বা ইসলামের যে অংশের উপর আমল করছেন, সেটাকে তিনি বড় মনে করা শুরু করেছেন।

আরো খারাপ ব্যাপার হল, অনেক মুসলমান ভাই দ্বীনের একটি অংশে মেহনত করে মনে করছেন, তিনি পরিপূর্ণ ইসলামের উপর আমল করছেন। যেমন: জিহাদ বাদ দিয়ে কোনো কোনো ভাই ইলম চর্চা নিয়ে ব্যস্ত থেকে, কিংবা দাওয়াতের মেহনত করে, কিংবা আত্মশুদ্ধির মেহনত করেই ভাবছেন তিনিই দ্বীনের সবচেয়ে দামী মেহনত করছেন, সবচেয়ে বড় 'নবীওয়ালা কাম' করছেন। কিংবা তিনি সেটাকেই পরিপূর্ণ দ্বীন মনে করছেন। অন্য মেহনতকে ছোট করে দেখছেন কিংবা অপ্রয়োজনীয় মনে করছেন, কিংবা বাকীগুলোর বিরোধিতা করছেন। বিরোধীতা না করলেও বলছেন, "দ্বীনের অনেক শাখা-প্রশাখা। সবাই তো আর সব করবে না বা করতে পারবে না। একেকজন একেক কাজ করবে। তাই কেউ কেউ জিহাদ করছে আর আমি অমুক মেহনত করছি, যার সাথে আমৃত্যু লেগেই থাকব। আমি জিহাদ করাটা সমর্থন করি, কিন্তু দ্বীনের সকল শাখায় একসাথে কাজ করা সম্ভব নয় বিধায় আমি যেটা করছি সেটাই করতে থাকব। অন্য মেহনত (যেমন জিহাদ) করব না।"

[জবাব: অথচ নফীরে আম বা জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় অন্য কোনো মেহনতের অজুহাতে জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকা বৈধ নয়; সকলকেই 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র কাজে শরীক হতে হবে। যে যেখানেই থাকুক, দ্বীনী যে কোন খেদমতই করুক না কেন, যে পেশাতেই থাকুক না কেন, সকলকেই জিহাদ করতে হবে, জিহাদে অংশগ্রহণ করার পর আমীর যাকে যে কাজে/দ্বীনী খেদমতে নিয়োজিত করবেন তখন তিনি সে কাজ করবেন; যেমনটি আমরা তাবুক, খন্দক, উহুদ ইত্যাদি জিহাদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই।]

৭. আমি যেই মেহনত করছি, এটিই সবচেয়ে দামী মেহনত। এর উপর অন্য কোনো মেহনত নেই। [জবাবঃ অথচ, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া হলো ‘আল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ’ আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা।” (মুসতাদরাকে হাকেম ২৪০৮ হাদীসটি সহীহ, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী। মুসনাদে আহমদ ২২০৬৪, সুনানে বাইহাকী ১৮২৫৩)

عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبيى صلى الله عليه وسلم قال:
ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، لا يناله الا افضلهم

হযরত আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ইরশাদ করেন- “জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। এ আমল ঐ ব্যক্তিই সম্পাদিত করতে পারবে, যে সর্বোত্তম/আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট অত্যধিক প্রিয়।” (মু‘জামে কাবীর, তাবরানী-৮/২২৪)

عن حنظلة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: خير أعمالكم الجهاد

হযরত হানযালা কাতিব (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, “তোমাদের আমল সমূহের মধ্যে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট আমল।” (তারিখে ইবনে আসাকির ১/৪৬৮)

অর্থাৎ জিহাদের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, মর্যাদাবান, সওয়াবের ও শানদার কোনো আমল ইসলামে নেই। আমরা যারা এর ব্যতিক্রম বলি বা মনে করি, তাদের ভয় করা দরকার, আমার কথা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর কথার বিপরীত হয়ে যাচ্ছে।]

৮. আমি জিহাদ করি সেটি আমার পিতা-মাতা পছন্দ করেন না। তাহলে পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্ট করে, তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে কিভাবে জিহাদ হবে? [জবাব: ভাই! এটা তো ফরযে কিফায়া জিহাদের ক্ষেত্রে শর্ত; বর্তমানে জিহাদ তো ফরযে আইন, তাই সন্তানের উপর পিতা-মাতার অনুমতি বা সন্তুষ্টির প্রয়োজন নেই। আমরা কি পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করব? অথচ এমনটি করতে শরীয়ত অনুমতি দেয়নি। প্রিয় রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - المصنف لابن أبي شيبة: ٣٤٤٠٦
"খালেকের নাফরমানী করে বান্দার আনুগত্য করা যাবে না।"]

৯. বর্তমানে মুসলমানদের খিলাফাহ নেই, আমীর নেই; তাই জিহাদ-ও নেই। আগে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হোক, পরে খলীফা যখন হুকুম দিবেন, তখন জিহাদ করব। [জবাব: ইসলামী রাষ্ট্র না থাকলে বা খলীফা, রাজা কিংবা শাসকের অনুমতি ছাড়া জিহাদ করা যাবে না বা এই অজুহাতে জিহাদ না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে- এরকম যারা দাবী করেন, তাদের এই দাবীকে আমরা ভুল মনে করি, কেননা, শরীয়তে এ সকল উক্তির কোনো দলীল/ভিত্তি নেই। রাসূল ﷺ, সাহাবায়ে কেরামসহ সালাফে সালেহীনের কেউ জিহাদের ব্যাপারে এ রকম কোনো শর্ত আরোপ করেননি। আল্লাহ্র বিধানে নেই, এমন বিষয়কে শর্ত হিসেবে জুড়ে দেয়া আল্লাহ্র বিধানকে অকার্যকর করার নামান্তর।
আরে ভাই! জিহাদ না করলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হবে কিভাবে, কে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করবে আর কেই-ই বা খলীফা হবে!!]

১০.আমরা এখন দুর্বল, আমাদের অস্ত্র নেই, প্রশিক্ষণ নেই; জিহাদ করব কিভাবে?

[জবাব: জ্বি ভাই! জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেলে একাকী হলেও, জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকা ফরযে আইন। মুজাহিদ ভাইদের হক্ব জামাত তালাশ করতে থাকা। শারীরিক, মানসিক, আর্থিক প্রস্তুতি নেয়া এবং সম্ভব হলে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নেয়া। যদি অস্ত্র, প্রশিক্ষণ বা অন্যান্য দুর্বলতার জন্য জিহাদ শুরু করা সম্ভব না হয় তাহলে এগুলোর সংশোধন করা ফরয হয়ে যায়। এটা স্বতন্ত্র একটা ফরযও বটে। আমরা কি সর্বাত্মক এই প্রস্তুতি যথাযথভাবে নিচ্ছি?]

প্রকৃতপক্ষে, এ ধরনের উক্তি বা আকীদা এগুলো সবই আত্মপ্রবঞ্চনা। 'হিকমাহ' কিংবা 'অজুহাতে'র নামে 'জিহাদ হতে পলায়ন'। আল্লাহ্‌ পাক হেফাযত করেন। আমীন। আসলে ভাই, এভাবে নিজেকে নিজে আমলের নামে ধোঁকা দেয়া হয়। নিজেকে একটি বুঝ দেয়া হয় যে, আলহামদুলিল্লাহ, আমি তো একটি মেহনত করছিই, তাই অন্য মেহনত (বিশেষতঃ জিহাদ) করার কোনো প্রয়োজন আমার নেই। তাই আমাদের ভয় করা উচিত, আমরা নিজেরা শরীয়তের অনুগামী না হয়ে প্রকারান্তরে দ্বীন ও শরীয়তকে নিজেদের নফসের অনুগামী বানিয়ে ফেলছি কিনা!!!

যদি শত্রুর মোকাবেলা করার সক্ষমতা না থাকে

জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার পর যদি শত্রুর মোকাবেলা করার সক্ষমতা থাকে, তাহলে অবশ্যই তাৎক্ষণিক বেরিয়ে পড়া এবং শত্রুর মোকাবেলা করা ফরজ। পক্ষান্তরে মুসলিমদের যদি জিহাদের সামর্থ্য না থাকে, তাহলে সামর্থ্য অর্জন করা পর্যন্ত জিহাদ বিলম্বিত করার সুযোগ আছে। ফুকাহায়ে কেরামের অনেকেই তা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তাছাড়া সামর্থ্যের বাইরে শরীয়ত কোনো বিধানই বান্দার উপর আরোপ করে না। এটি শরীয়তের মানসূস ও সর্বস্বীকৃত একটি নীতি।

كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بخلاف الاستطاعة قي الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها لأن الوجوب هنا لا يتم إلا بها. ـ مجمع الفتاوى: ٢٨/٢٥٩

"যেমনিভাবে অভাবী ঋণগ্রস্তের উপর ওয়াজিব, ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করা, যদিও নগদে তার সামর্থ্যের চেয়ে অতিরিক্ত পরিশোধের নির্দেশ দেয়া হবে না এবং সামর্থ্য না থাকার কারণে জিহাদ বিলম্বিত হওয়ার ক্ষেত্রে তেমনিভাবে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ, শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত করা ওয়াজিব। কারণ ওয়াজিব যা ব্যতীত আদায় করা যায় না, তাও ওয়াজিব। পক্ষান্তরে হজ্জ ইত্যাদির সামর্থ্য। এখানে সামর্থ্য অর্জনের চেষ্টা করা ওয়াজিব নয়। কারণ, এখানে সামর্থ্য ব্যতীত বিধানটি ওয়াজিবই হয় না।" (মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/২৫৯)

শায়খ সালিহ আলফাওযান রহ. বলেন,

إما إذا كان المســلمون لا يســتطيعون قتال الكفار فهم يؤجلون الجهاد إلى أن يقدروا. ـ الجهاد وضوابطه الشرعيه، ص:٤٧

"মুসলিমরা যদি কাফেরদের সঙ্গে কিতালের সামর্থ্য না রাখে, সামর্থ্য হওয়া পর্যন্ত কিতাল বিলম্বিত করবে।"

তবে এই সুযোগ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য! জিহাদ ফরজ হওয়ার পর তা বিলম্বিত করার এই সুযোগটা শুধুই প্রস্তুতি গ্রহণ ও সামর্থ্য অর্জন করার জন্য, বসে থাকার জন্য নয়। যে সামর্থ্যের অভাবে শত্রুর মোকাবেলা করা যাচ্ছে না, এসময় তা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ফরজ।

ইমাম আবুল হাসান তুসূলি রহ. বলেন,

قال- سيدي- "العربي الفاسي": لا يبرأ المسلمون من عهدة المدافعة، ونصرة من عجز، إلا إذا استفرغوا الوسع في إزاحة الكفار من المدائن التي أخذوها للمسلمين، (فلو نازلوها فلم تفتح، وجب عليهم معاودتها كلما أكنهم ذلك، حتى يفتحيا الله عليهم، ولا فرق في ذلك بين المدائن المأخوذة للمسلمين حديثا أو قديما)

لأن الوجوب والتعيين متعلّق بالمسلمين، لا بقيد زمان، ولا مكان، إلا أنه: يتيّن على الحاضر زمانا ومكانا، على ما مرّ ترتيبه ـ فانا (فإذا) لم يفعل لعذر، أو لغيرعذر، وجب على غيره ممن يليه

كما قاله "ابن عرفة"، عن "المازري": (وترك من تقدم من أئمة المسلمين مدائن الإسلام في أيدي الكفار، هم بذلك في محل محل العصيان، لا في محل الأفتداء والاستنان، وقديما قيل: "أسلك سبيل

الهدى، ولا يضرك قلة السالكين، واترك طريق الردى، ولا يضرك كثرة الهالكين")

١ اهـ كلامه.- أجوبة التسولى عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد، ص: ٢٧٩-٢٨٠

"সাইয়িদি ফাসি রহ. বলেছেন, মুসলিমরা অক্ষমদের সাহায্য ও শত্রু প্রতিহত করার দায় থেকে কেবল তখনই মুক্ত হতে পারবে, যখন তারা মুসলিমদের ওই সকল শহর থেকে কাফেরদের বিতাড়িত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবে, যেগুলো কাফেররা দখল করে নিয়েছে।.....চাই তারা মুসলিমদের এই শহরগুলো নতুন করে দখল করুক বা আগে দখল করে থাকুক।

কারণ, ফরজে আইনটা মুসলিমদের সঙ্গে সম্পৃক্ত; স্থান ও কালের শর্তমুক্ত। হ্যাঁ, ইতিপূর্বে আলোচিত বিন্যাস অনুসারে তা আদায় করবে তারাই, যারা স্থান কালের বিচারে উপস্থিত। তারা যদি ওজরে কিংবা বিনা ওজরে না করে, যারা তাদের নিকটবর্তী, তাদের উপর ফরজ।

যেমন ইবনে আরাফা রহ. মাযুরি রহ. এর উদ্ধৃতিতে বলেছেন, পূর্ববর্তী শাসকদের জন্য ইসলামী শহরগুলো কাফেরদের হাতে ছেড়ে রাখার ক্ষেত্রে তারা গুনাহগার। এখানে তাদেরকে আদর্শ বানানো বা তাদের অনুসরণ করার সুযোগ নেই। বহুকাল আগেই বলা হয়েছে, তুমি সঠিক পথে চল। এ পথের পথিক কম হওয়া তোমার ক্ষতি করবে না। বিভ্রান্ত পথ ছাড়। সে পথে ধ্বংসপ্রাপ্তদের আধিক্যও তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।" (আজবিবাতুত তুসূলি: ২৭৯-২৮০)

প্রিয় ভাই! সতর্ক হোন!

১. আমরা যারা জিহাদ করছি না, জিহাদ করার জন্য যথাসাধ্য ও যথার্থ প্রস্তুতি গ্রহণ করছি না, জিহাদ করার চিন্তা-ফিকিরও করছি না, আমরা একটি বিষয় চিন্তা করি, ভাই! আমরা যদি এটা বুঝে থাকি, 'জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে', তাহলে একটু লক্ষ্য করি-

আমাদের দ্বারা শরীয়তের একটি ফরযে আইন হুকুম পরিত্যাগ করা হচ্ছে। ওযর বা অপারগতা বশতঃও যদি এক ওয়াক্ত নামায ছুটে যায় বা রমজান মাসের একটি রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়, তবুও আমরা কতই না আফসোস করি, নিজেকে কতই না ধিক্কার দেই। অথচ আমার দ্বারা শরীয়তের আরেকটি ফরযে আইন হুকুম ছুটে যাচ্ছে সেদিকে আমি কোনো ভ্রুক্ষেপই করছি না।

তাই আমরা যারা জিহাদের মেহনত করছি না, ভয় হয়, আমরা আল্লাহ পাকের কাছে ফরয তরককারী সাব্যস্ত হয়ে যাচ্ছি কিনা, আমার দ্বারা ফরয তরকের গুনাহ হয়ে যাচ্ছে কিনা, যদিও আমরা দ্বীনী অন্য কোনো মেহনতের সাথে জড়িত!!

যদিও আমি আলেম হই, জিহাদ পরিত্যাগ/না করার কারণে আমি আল্লাহ পাকের কাছে হয়ে যেতে পারি ফরয তরককারী আলেম। যদিও আমি আমার অন্তর ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের অন্যান্য সকল গুনাহ থেকে পবিত্র 'সালেক' হই, তবুও আমি জিহাদী মেহনত না করার অপরাধে আল্লাহ সুবহানাহু

ওয়া তা'আলার কাছে ফরয তরককারী সাব্যস্ত হয়ে যেতে পারি। যদিও আমি আমার যিন্দেগীর সকল কিছু কুরবানী করনেওয়ালা দাঈ কিংবা মুবাল্লিগ হই আর জিহাদ না করি, তাহলেও আল্লাহ তাআলার দরবারে জিহাদ না করার অপরাধে আমি পাকড়াও হতে পারি। তাই, এই ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করি।

আমি আলেম হয়েছি, তাই বলে কি ভাই আমার উপর জিহাদের হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে? না, হয়নি। কেবল মাদরাসার খেদমত করে আমি হয়ত আল্লাহ্র দরবারে পার পাব না। তাই আমাকে ইলমী ময়দানে বিচরণের পাশাপাশি জিহাদের ময়দানেও বিচরণ করতে হবে, ইনশাআল্লাহ!

আমি হক্কানী পীর সাহেবের মুরিদ কিংবা খলীফা হই, তাই বলে কি ভাই আল্লাহ্ তা'আলা আমার থেকে 'জিহাদ' তলব করবেন না? অবশ্যই করবেন। কেননা, নফসের তাযকিয়া যেমনি ফরয, এটিও তো বর্তমানে ফরযে আইন মেহনত। তাই, ভাই! তাযকিয়ার মেহনতের পাশাপাশি আমাকে অবশ্যই জিহাদের মেহনত করতে হবে, ইনশাআল্লাহ।

আমি যদি দাঈ কিংবা মুবাল্লিগ হই, ভাই! আমাকেও মনে রাখতে হবে, দাওয়াতের হুকুম যিনি করেছেন, জিহাদের হুকুমও তিনিই দিয়েছেন। তিনি কি আমাকে এমনি এমনি ছেড়ে দিবেন? জিহাদের হিসাব নিবেন না? জিহাদ ত্যাগ করে যদি আমি 'ফরয তরককারী' সাব্যস্ত হই, তাহলে আল্লাহ্র শাস্তি আমাকেও পাকড়াও করতে পারে, ভাই। তাই, ভাই, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের পাশাপাশি আমাদেরকে মজবুতির সাথে জিহাদের মেহনতও করতে হবে, ইনশাআল্লাহ!

এইভাবে, আমরা যে যাই করি না কেন, যেখানেই থাকি না কেন, আমাদেরকে যার যার কর্ম, পেশা বা মেহনতের পাশাপাশি অবশ্যই জিহাদের মেহনতের সাথে জুড়তে হবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্র জন্য কবুল করুন। জিহাদ করা আমাদের জন্য সহজ করে দিন। আমীন।

আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ ٣١

"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের মধ্যে জিহাদকারীকে এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি (জিহাদের ব্যাপারে) তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি।" (৪৭ সূরা মুহাম্মাদ:৩১)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٤٢

"তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ তাআলা এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্য্যশীল।" (৩ সূরা আলে ইমরান: ১৪২)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا۟ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِۦ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٦

"তোমরা কি মনে কর, তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নিবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।" (সূরা তাওবাহ্ ০৯:১৬)

إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا وَيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيۡـٔٗاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٣٩

"তোমরা যদি (তাঁর পথে জিহাদের জন্য) বের না হও, তাহলে (এ জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন (দুনিয়াতে তোমাদের উপর কুফ্ফারদের চাপিয়ে দিয়ে আর আখিরাতে জাহান্নামের আগুন দিয়ে) এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা বদল করে দিবেন, তোমরা তার কোনই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" (০৯ সূরা তাওবা: ৩৯)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার শাস্তি ও ক্রোধ থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

২. আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার। জিহাদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। জিহাদের প্রাথমিক পর্যায়- হল দাওয়াত ও ই'দাদের (প্রস্তুতি) পর্যায়। আর শেষ পর্যায় হল- হিজরত ও ক্বিতাল (তথা সশস্ত্র যুদ্ধ)। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার মত সক্ষমতা অর্জিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দাওয়াত ও ই'দাদের মেহনত চালিয়ে যেতে হবে। দাওয়াত

ও ই'দাদ (আমীরের পরামর্শ সাপেক্ষে) আমাদের দ্বীনী বা দুনিয়াবী অন্যান্য কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি চালিয়ে নেয়া সম্ভব।

'দাওয়াত' বলতে বুঝাচ্ছি- মুসলিম উম্মাহ্‌র ঈমান ও আকীদা সহীহ করার মেহনত করা, বিশুদ্ধ তাওহীদের বুঝ প্রদান করা, আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ (আল্লাহ্‌র জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহ্‌র জন্য শত্রুতা করতে শিখানো), সর্বোপরি জিহাদের গুরুত্ব বুঝিয়ে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা (তাহ্‌রীদ 'আলাল ক্বিতাল) এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ্ তৈরি করা। এই কাজগুলো আমীরের পরামর্শ সাপেক্ষে ঘরে বসে এবং অন্যান্য মেহনতের পাশাপাশি করাও সম্ভব।

আর **'ই'দাদ' (প্রস্তুতি)** বলতে বুঝাচ্ছি- মানসিক ভাবে যুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা, জিহাদের ফায়দা-ফাযায়েল ও মাসাইল ভালভাবে আত্মস্থ করা, শারীরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা (নিয়মিত ব্যায়াম করা), অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়া, দাতা সংগ্রহ করা, অস্ত্রের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা, ইত্যাদি। এ সকল কাজেরও অধিকাংশ আমীরের পরামর্শ সাপেক্ষে ঘরে বসে এবং অন্যান্য মেহনতের পাশাপাশি করা সম্ভব।

দাওয়াত ও ই'দাদ যদি জিহাদের জন্য হয়, তাহলে তা-ও জিহাদের অন্তর্ভূক্ত, এবং একাজ করেও জিহাদের সওয়াব হাছিল হবে, ইনশাআল্লাহ। সুতরাং ভাই, আমাদের কি একথা বলে বসে থাকার সুযোগ আছে যে, "আমরা জিহাদ করব কিভাবে? আমাদের জিহাদ করার মত সক্ষমতা নেই।" না ভাই, সে সুযোগ নেই। ক্বিতাল বা চূড়ান্ত যুদ্ধের আগে আমাদেরকে অবশ্যই 'যুদ্ধের মাঠ' প্রস্তুত করতে থাকতে হবে।

বাকী রইল **'হিজরত ও ক্বিতাল'**। জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় যখন জিহাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে, যুদ্ধের মাঠ প্রস্তুত হয়ে যাবে বা ময়দানে

ঝাপিয়ে পড়ার প্রয়োজন হবে, তখন কিন্তু ভাই আমাদেরকে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে। আমাদের ঘরবাড়ি, পরিবার পরিজনদের ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধের জন্য বেড়িয়ে পড়তে হবে ও যুদ্ধ করার জন্য যেখানে যাওয়া দরকার সেখানে যেতে হবে (এটি হল **হিজরত**)। আর যখন আমরা বাতিল ও আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব, লড়াই করব- সেটা হল জিহাদের সর্বশেষ পর্যায় অর্থাৎ **ক্বিতাল তথা সশস্ত্র যুদ্ধ।** অবশ্য, জিহাদে অংশগ্রহণের পর জিহাদের প্রয়োজনে আমীর যাকে যে কাজ দিবেন, তিনি সেটাই করবেন, সেটাই তার জন্য জিহাদ। আমীর যাকে ময়দানে লড়াইয়ের দায়িত্ব দিবেন, তিনি লড়াই করবেন; যাকে ইলম চর্চা ও গবেষণার দায়িত্ব দিবেন, তিনি সেটা করবেন; যাকে চিকিৎসার দায়িত্ব দিবেন, তিনি চিকিৎসা করবেন; যাকে মিডিয়ার দায়িত্ব দিবেন, তিনি মিডিয়ায় কাজ করবেন ইত্যাদি। এভাবে প্রত্যেকের কাজই তখন জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র অন্তর্ভূক্ত হবে, প্রত্যেকেই জিহাদের সওয়াব লাভ করবেন, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

৩. নবুয়তের যামানায় সর্বপ্রথম যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তাআলা মুনাফেকদের মুখোশ উন্মোচন করেন তা হলো ওহুদের যুদ্ধ। মুনাফেকদের সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার অনুসারী ৩০০ জন মূল বাহিনী থেকে পেছনে সরে যায়। বাকী ৭০০ জন সাহাবী ৩০০০ কাফেরের বিরুদ্ধে ওহুদের ময়দানে যুদ্ধ করেন। এ থেকে বুঝা গেল, সাহাবায়ে কেরামের জামাতে ঘাপটি মেরে বসেছিল এমন মুনাফেকের সংখ্যা ৩০%। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এই মুনাফিকরা সকল আমলই করত। তারা

নামায পড়ত, রোযা রাখত, যাকাত দিত, দান-খয়রাত করত, হজ্জ করত, সবই করত। করতো না শুধু একটি আমল, যেই আমল থেকে এরা সর্বদা পিছিয়ে থাকত। যেহেতু জিহাদের ময়দানে গেলে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে, তাই এরা মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ থেকে পালাত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,"যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে সে যুদ্ধ করেনি, কিংবা মনে মনে যুদ্ধ করার ইচ্ছাও পোষণ করেনি, সে মুনাফেকির একটি অংশ নিয়ে মারা গেল।" (সহীহ মুসলিম-৫০৪০)

তাই, জিহাদ না করে ঘরে বসে থেকে আমরা নিজেদের ব্যাপারে কিভাবে এতটা নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে, আমাদের অন্তরে নেফাক নেই?

অথচ সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আযমাঈনগণ সর্বদা নিজেদের ব্যাপারে নিফাকের ভয় করতেন আর এই ভয়ে তাঁরা কখনো জিহাদ পরিত্যাগ করেননি। হযরত ইবনে আবি মুলাইকা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি ত্রিশজন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম আযমাঈনদের সহিত সাক্ষাৎ করেছি। তাঁরা প্রত্যেকে নিজের সম্পর্কে মুনাফিক হওয়ার ভয় করছিলেন।" (বুখারী)

৪. যে সকল ভাই মা-শা-আল্লাহ জিহাদের বুঝ এবং অনুপ্রেরণা রাখেন তাদেরকে বলছি। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে-

জিহাদ মানেই না জেনে না বুঝে যখন তখন যেখানে সেখানে এলোপাতাড়ি কিছু আক্রমণ করা নয়। এজন্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট মাসআলা-মাসায়েল

রয়েছে, শরীয়াহ'র সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। জিহাদের জন্য প্রথমে জিহাদের প্রয়োজনীয় ইলম অর্জন করতে হবে। তারপর শরীয়াহ্ ও সমর বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে শরীয়াহ'র নীতিমালা অনুসারে জিহাদের কাজ আঞ্জাম দিতে হবে।

৫. 'জিহাদ ফরজে আইন' বললে কেউ কেউ মনে করেন, তাহলে আমরা যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, এই মুহূর্তেই আমাদেরকে জিহাদে বেরিয়ে পড়তে হবে; এমনকি আমাদের যদি শত্রুর মোকাবেলা করার সামর্থ্য নাও থাকে, তবুও বের হতেই হবে এবং বর্তমান সামর্থ্যে যতটুকু সম্ভব, তাতেই কিছু একটা করে ফেলতে হবে। কারণ তা ফরজে আইন।

এই ধারণার ফলে বাস্তবে বেশ কিছু সমস্যাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। যারা এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী, তারা এমন কিছু করে বসেন, যা প্রকৃত অর্থে জিহাদের জন্য ক্ষতিকর। তাদের বাস্তবতা বিবর্জিত ও অপরিণামদর্শী এসব কর্মকাণ্ডের ফলে জিহাদের বদনাম হয়, তেমনি চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে জিহাদী কার্যক্রম প্রচণ্ডভাবে বাধাগ্রস্ত হয়, চলমান জিহাদী মিশন বহু বছর পিছিয়ে যায়। তাছাড়া জিহাদ সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ মুমিনগণও জিহাদ ও মুজাহিদদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেন এবং যারা সঠিক পদ্ধতির জিহাদের কথা বলতে চান, তাদের কথাও তারা শুনতে রাজি হন না। তাই জিহাদের দাবী হল, মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সবসময় লাভ-ক্ষতির হিসাব ভালোভাবে কষে, ভবিষ্যৎ পরিণাম ও ফলাফল চিন্তা করে, ছোট স্বার্থের উপর বড় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার খাতিরে প্রয়োজনে ছোট অভিযানগুলোকে পরিহার করা। যেন আমার বিক্ষিপ্ত কোনো কাজ বা অভিযানের দ্বারা ময়দানে সক্রিয় মুজাহিদ ভাইদের ভারসাম্যপূর্ণ

মানহাজের অগ্রগতির অন্তরায় সৃষ্টি না হয়। প্রিয় ভাই, আমাদেরকে শুধু 'জযবাতি' হলে চলবে না, 'নযরিয়াতি' হতে হবে। শুধু জযবায় বা জোশে কিছু করা যাবে না, হুশের সাথে অগ্রসর হতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, হিন্দুস্তান (ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান) এই ভূমিতে যারা অবস্থান করছি, এবং যারা জিহাদ করতে ইচ্ছুক তাদের মূল টার্গেট হল 'হিন্দুত্ববাদী শক্তি' (সাপের মাথা)। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ

"সুতরাং তোমরা কুফর প্রধান (সাপের মাথা)-দের সাথে যুদ্ধ কর।"
(০৯ সূরা তাওবা:১২)

অতএব, এতদঞ্চলে বাধ্য না হলে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আমরা এখনি অস্ত্র ধরব না। কেননা এর দ্বারা লাভের চেয়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আমাদেরকে আবেগ/জযবা পরিত্যাগ করে মাথা ঠান্ডা রেখে দুরদর্শী চিন্তা করতে হবে এবং সেকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পবে। আমার একটি ভুল পদক্ষেপের কারনে যেন ময়দানে কাজের পরিবেশ নষ্ট না হয়। হিন্দুত্ববাদী শক্তির বিরুদ্ধে যতটুকু শক্তি আমাদের অর্জন করা দরকার তা অর্জন হওয়ার আগেই যেন আমরা দুর্বল হয়ে না যাই। ছোট তাগুতের পিছনে সময়, অর্থ আর জীবন খরচ করে শেষ করে ফেললে পরে মূল তাগুতের বিরুদ্ধে আমরা লড়তে পারবো না। ফলে, আমাদের মূল মাকসাদে (ফেতনা, কুফর ও শিরকের মূল উৎপাটন করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা, যেন দ্বীন সার্বিকভাবে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য হয়ে যায়) পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমরা

যদি হিন্দুত্ববাদী শক্তির ধ্বংস সাধন করতে পারি, তাহলে দাদাদের পা-চাটা গোলাম মুরতাদ শাসকগোষ্ঠী এমনিতেই সোজা হয়ে যাবে, তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের উচিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বানী করা কালো পতাকার বাহিনীতে যোগ দিয়ে ভাইদের দিক-নির্দেশনা মোতাবেক জিহাদী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া, আর যারা কালো পতাকার বাহিনীর ভাইদের সন্ধান পাইনি তারা এই জামাতকে এখলাসের সাথে তালাশ করতে থাকা এবং আলোচ্য পর্বের শেষাংশে যে কার্যতালিকা দেয়া হয়েছে তা অনুসরণ করতঃ যুদ্ধের ময়দান প্রস্তুত করতে থাকা, ইনশাআল্লাহ্।

আলহামদুলিল্লাহ, বর্তমানে কালোপতাকার বাহিনীর ভাইয়েরা বৈশ্বিক/ আন্তর্জাতিক জিহাদী মিশন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। আপনার আশেপাশেই ভাইয়েরা আছেন। তাই নতুন করে জিহাদী কোনো জামাত তৈরির প্রয়োজন নেই। আমাদের কাজ হল নিজেদেরকে প্রস্তুত করা এবং কালো পতাকার ভাইদের সাথে জুড়ে যাওয়া। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে জিহাদের এই মোবারক কাফেলায় শরীক হওয়ার জন্য কবুল করুন। আমীন।

৬. অন্যদিকে আরেকদল ভাই আছেন, তারা যেহেতু দেখেন, এই মুহূর্তে কার্যত জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার মতো অবস্থা, শক্তি-সামর্থ্য আমাদের নেই, সুতরাং তারা মনে করেন, বর্তমানে জিহাদ ফরজ এই কথাও বলা যাবে না। আমাদেরকে এখন জিহাদি সকল কার্যক্রম থেকে হাত পা গুটিয়ে দ্বীনের অন্য কাজগুলোই করে যেতে হবে। জিহাদের বিষয়টি আপাতত স্থগিত রাখতে হবে। এই ধারণার ফলে তারা বর্তমান পরিস্থিতিতে যা করা

শরীয়তের হুকুম তা থেকেও বিরত থাকেন। তারা মনে করেন, আমাদের যেহেতু শত্রুর মোকাবেলা করার সামর্থ্য নেই, সুতরাং আমাদের করার কিছুই নেই। এজন্য তারা সময়ের দাবি, হেকমত ও শরীয়তের মানসা মনে করেই অজ্ঞতাবশত চলমান সহীহ পদ্ধতির জিহাদেরও বিরোধিতা করেন।

অবশ্য তাদের কেউ কেউ প্রস্তুতির কথা বলেন এবং দাবিও করেন, আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। কিন্তু প্রস্তুতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ এমনভাবে করেন, যার সঙ্গে জিহাদ ও কিতাল তথা যুদ্ধের কোনো দূরবর্তী সম্পর্কও নেই, বস্তুত তাদের ভবিষ্যত হাজার বছরের কর্মতালিকা ও কর্মপরিকল্পনাতেও জিহাদ ও যুদ্ধের নাম গন্ধও নেই। যা আছে তা হল জিহাদ ও কিতালের বিরোধিতা, তাহরীফ (জিহাদের অর্থ বিকৃতি) ও অপব্যাখ্যা। তাদের দৃষ্টিতে জিহাদ ও কিতালের নাম নিলেও যেহেতু শত্রুরা নারাজ হয়, সুতরাং আমাদের এই দুর্বলতার মুহূর্তে তাদেরকে নারাজ করা যাবে না। আমরা কিছু করতে গেলেই আমেরিকার গোয়েন্দারা নিজ দেশে বসেই সব দেখে ফেলে, শুনে ফেলে। তাই (এই ভয়ে) এখন জিহাদের ব্যাপারে কোনো নড়াচড়া কিংবা 'টু' শব্দটিও করা যাবে না। তাগুত ও কাফের মুরতাদদের দৃষ্টিতে 'ভাল'(?) থেকে তাদের আস্থা অর্জন করার জন্য, জিহাদ বাদে অন্যান্য মেহনত টিকিয়ে রাখতে যা যা করা দরকার, এখন আমাদেরকে তাই করতে হবে।

বর্তমানে দ্বীনের কাজ করতে হলে, তাগুতের কাছে নিজেকে এতটাই 'পরিচ্ছন্ন' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে যে, জিহাদের নামটিও মুখে উচ্চারণ করা যাবে না; বরং দুশমনরা যেন কোনো ছুতো নাতায় আমার

প্রতি সন্দেহের দৃষ্টিও দিতে না পারে, এজন্য আগে বেড়ে 'জঙ্গীবাদ' বিরোধী কিছু কর্মকাণ্ডেও সক্রিয় থাকতে হবে। জিহাদ ও কিতালের আলোচনা করা, জিহাদ ও মুজাহিদের পক্ষে কথা বলা, এমনকি জিহাদ ও কিতালের ইলম চর্চাকেও হেকমত ও প্রজ্ঞাপরিপন্থী মনে করতে হবে। এজন্য আগে বেড়ে নিজের মাদরাসাকে 'জঙ্গীবাদ'মুক্ত ঘোষণা দিতে হবে, 'জিহাদ ও সন্ত্রাস' বিরোধী মানববন্ধনে অংশ নিতে হবে, জিহাদ বিরোধী ফতোয়ায় লাখো মুফতীর স্বাক্ষর নিতে হবে, যে সকল তালিবুল ইলম মাদরাসায় ই'দাদ গ্রহণের চেষ্টা করবে তাদেরকে পিটাতে হবে, আর যে সকল তালিবুল ইলম কিংবা মাদরাসার শিক্ষক জিহাদ নিয়ে কথা বলেন, তাদেরকে মাদরাসা থেকে বহিস্কার করতে হবে।

৭. তাত্ত্বিক ইসলামের দর্শন: এই দর্শনটি আমাদের অনেক উলামায়ে কেরামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু ইলমে দ্বীনের তাত্ত্বিক অধ্যয়ন করা, শিক্ষা দেওয়া বা আলোচনা করা, বয়ান করা, ছোট খাট শাখাগত বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হওয়া, ইত্যাদিকেই কেবল দ্বীনদারি মনে করতে থাকা বা দ্বীনের আসল কাজ মনে করা বা কেবল এতটুকুর উপর সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকা। ব্যবহারিক ইসলামের দিকে না আসা, দা'ওয়াহ্, ই'দাদ ও জিহাদের পথে অগ্রসর না হওয়া।

৮. হায় আফসোস! আমরা কেউ কেউ জিহাদের অর্থই পাল্টিয়ে ফেলছি। জিহাদের অর্থ কেউ কেউ করছি 'দাওয়াত'। তাই দাওয়াতের মধ্যে জিহাদের ফায়দা-ফাযায়েল সম্বলিত আয়াত ও হাদীসগুলোকে ব্যবহার করছি। এর দ্বারা কী ফায়দা হচ্ছে, ভাই?? এর দ্বারা উম্মত জিহাদ বাদ দিয়ে, জিহাদকে ভুলে গিয়ে দাওয়াতী মেহনতে জুড়ে থাকবে, জিহাদ

করার কোনো প্রয়োজনই তারা অনুভব না করবে না। সুতরাং আমাদের এহেন কর্মকাণ্ডের দ্বারা লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হচ্ছে, ভাই!

কেউ কেউ জিহাদের অর্থ করছি 'গণতান্ত্রিক রাজনীতি'। তাই কুফুরী ও শিরকের আস্তানা গণতন্ত্রের মিটিং-মিছিলকে আমরা জিহাদ ভাবছি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা লাভ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দিবাস্বপ্ন(!) দেখছি। আর এটাকেই জিহাদ ভাবছি। নিজেদেরকে (গণতান্ত্রিক!) 'মুজাহিদ' ভাবছি।

হায়! আফসোস আমাদের জন্য! আমরা যা করছি তার জন্য! আর কতকাল আমরা এভাবে নিজেদেরকে ধোকা দিতে থাকব??

যে যত বেশি জিহাদের অর্থকে বিকৃত করতে পারছি, কিংবা জিহাদ থেকে পালানোর যত বেশি উপায় আবিষ্কার করতে পারছি, আমরা নিজেদেরকে তত বেশি 'হেকমতওয়ালা' ভাবছি। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!!!

৯. কোনো কোনো ভাই, নিজে যা করছি তাকেই জিহাদ নাম দিচ্ছি, আর এই অলীক আত্মতৃপ্তিতে ভুগছি, আমিও জিহাদ করছি। যেমন কলমের জিহাদ, বয়ান-বক্তৃতার জিহাদ, তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধির/ নফসের জিহাদ ইত্যাদি। এভাবে আমরা নিজেরাও বিভ্রান্ত হচ্ছি, উম্মাহ্‌কেও বিভ্রান্ত করে যাচ্ছি। আল্লাহ পাক হেফাযত করুন। আমীন।

১০. অবশেষে, আল্লাহ পাক আমাদের যাদেরকে জিহাদের বুঝ দিয়েছেন, যারা কোনো না কোনো ভাবে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত আছি, যারা কোনো না কোনো ভাবে জিহাদের জন্য মেহনত করছি, সেসকল ভাইদেরকে বলছি! আমরা যেন নিজেদেরকে 'বড়' ভেবে অন্যান্য মেহনতের

ভাইদেরকে 'ছোট' বা 'তুচ্ছ' না ভাবি। আমরা এক উম্মত, আমরা সকলে ভাই-ভাই, একে অপরের সহযোগী; যেন একটি শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, একটি বৃক্ষের ডাল-পালা।

যারা অন্যান্য ময়দানে মেহনত করছেন যেমন ইলমী খেদমত, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত, তাযকিয়ার মেহনত ইত্যাদি করছেন তাদেরকে দীল থেকে মহব্বত করি। তারাও দ্বীনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও দামী দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

তবে, জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় যে সেকল ভাইদেরও যে অনেক করণীয় আছে, সে সম্পর্কে আমরা তাদেরকে মহব্বত ও দরদের সাথে দাওয়াত দিতে থাকব, হিকমতের সাথে বুঝাতে থাকব এবং নিজের ও ভাইয়ের কবুলিয়তের জন্য দুআ করতে থাকব, ইনশাআল্লাহ।

আর নিজেকেই আমরা তুচ্ছ ও কমজোর মনে করব। কেননা, আজকে ঐ ভাই হয়ত বুঝছেন না, আগামীকাল হয়ত বুঝবেন, হতে পারে তখন আল্লাহ পাক তার দ্বারা আমার চেয়ে বেশি খেদমত নিবেন। আর আমার শেষ পরিনতি কী হবে, তা তো আমার জানা নেই। তাই ভাই! 'আমি অন্যদের চেয়ে নিজেকে ছোট মনে করি'- এটা শুধু কথায় বললে হবে না, আমার আচার-আচরণ, অঙ্গ-ভঙ্গি ও উচ্চারণ, বলা ও লিখায়ও যেন তা সর্বদা প্রকাশ পায়।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে সকল প্রকার ভ্রান্ত আকীদা, চিন্তা-চেতনা ও কার্যকলাপ থেকে হিফাযত করুন। আমীন।

জিহাদের অপর নাম 'জীবন'!! – একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা:

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡۖ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের 'সে কাজের' প্রতি আহ্বান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। (সূরা আল আনফাল ৮:২৪)

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ أَيْ: لِلْحَرْبِ الَّتِي أَعَزَّكُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا بَعْدَ الذُّلِّ، وَقَوَّاكُمْ بِهَا بَعْدَ الضَّعْفِ، وَمَنَعَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ بَعْدَ الْقَهْرِ مِنْهُمْ لَكُمْ

প্রখ্যাত মুফাসসির মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রহঃ বিশিষ্ট তাবেয়ী উরওয়াহ ইবনে যুবাইর রহঃ থেকে ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ এই আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে " لِمَا يُحْيِيكُمْ (যা তোমাদেরকে জীবনদান করবে)" এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল- "**যুদ্ধ** -যার দ্বারা লাঞ্ছনার পর আল্লাহ তোমাদেরকে সম্মানিত করেছেন, দুর্বলতার পর শক্তিশালী করেছেন, তোমাদের উপর শত্রুদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করার পর তোমাদেরকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

ইমাম রাজী রহঃ, ইমাম কুরতুবী রহঃ ও একই তাফসির করেছেন।

প্রিয় ভাই, লক্ষ্য করুন! আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন কেন বললেন, জিহাদের মধ্যে আমাদের জন্য রয়েছে জীবন??

আমরা তো মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ করিনা, বা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছি; অথচ যতদিন জিহাদ ছিল, উম্মাহ যতদিন জিহাদ করেছে, তখন কি উম্মাহ্ অধিক হারে জীবন দিয়েছে, তখন কি উম্মাহ্র রক্তক্ষরণ বেশি হয়েছে, নাকি উম্মাহ্র গাফলতীর যামানায়, যখন উম্মাহ্ হয় জিহাদের ব্যাপারে ছিল উদাসীন কিংবা জিহাদ বিমুখ??

এ বিষয়টি আমরা ইতিহাসের আলোকে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

নবুয়তের যামানায় সংগঠিত হওয়া যুদ্ধ সমূহের পরিসংখ্যান

নবুয়তের যামানায় সংগঠিত হওয়া যুদ্ধ সমূহের পরিসংখ্যান				
যুদ্ধের নাম	মুসলিম সৈন্যসংখ্যা	শহীদের সংখ্যা	কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা	নিহত কাফেরের সংখ্যা
বদর যুদ্ধ	৩১৩	১৪	৯৫০	৭০
উহুদ যুদ্ধ**	৭০০	৭০	৩০০০	২২
খন্দক যুদ্ধ	৩,০০০		১০,০০০	
বনু কুরায়যার যুদ্ধ				৬০০-৭০০
খায়বার যুদ্ধ		১৬		৯৩
মূতার যুদ্ধ	৩,০০০	১২	২,০০,০০০	অগণিত

হুনাইনের যুদ্ধ	১২,০০০	০৪		৭০
হযরত আবু বকর রাদি. এর খিলাফতের সময় সংগঠিত যুদ্ধসমূহ				
শিকলের যুদ্ধ				অসংখ্য
মাযারের যুদ্ধ				৩০,০০০
ওয়ালাজার যুদ্ধ				অসংখ্য
উল্লায়শ (বা আমগিশায়ার) যুদ্ধ				৭০,০০০
ফিরাযের যুদ্ধ				অসংখ্য
আযনাদাইন	৩০,০০০	৪০০	১,০০,০০০	অসংখ্য

হযরত উমর রাদি. এর খিলাফতের সময় সংগঠিত যুদ্ধসমূহ				
ফিহল	২৫,০০০		৮০,০০০	প্রায় ৮০,০০০
ইয়ারমুকের যুদ্ধ	৩৬,০০০	৪,০০০	২,৪০,০০০; মতান্তরে ৪,০০,০০০	৭০,০০০; মতান্তরে ১,২০,০০০
নামারিকের যুদ্ধ	১০,০০০		১,০০,০০০	
সেঁতুর যুদ্ধ**		৪,০০০		৬,০০০
বুআইবের যুদ্ধ	১২,০০০		১,৫০,০০০	প্রায় ১,৫০,০০০

কাদেসিয়ার যুদ্ধ	৬০,০০০	৮,৫০০	৩০,০০০	গণনাতীত
হযরত উসমান রাদি. এর খিলাফতের সময় সংগঠিত যুদ্ধসমূহ				
মাস্তুলের যুদ্ধ (৩৫ হিজরী)	২০০ নৌযান	অসংখ্য	১,০০০ নৌযান	অসংখ্য

বি.দ্রঃ

১. শূন্য ঘরগুলোর তথ্য ঐতিহাসিকগণ নির্ণয় করতে পারেননি।

২. ** এই যুদ্ধে মুসলিমদের জয় হয়নি, সাময়িক বিপর্যয় হয়েছিল, বাকি সকল যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করেন।

উল্লেখ্য, নাহাওয়ান্দ যুদ্ধে ও রোম-পারস্য বিজয়কালে হওয়া শহিদদের হিসাব, মাস্তুলের যুদ্ধের শহিদদের হিসাবও ঐতিহাসিকরা নির্ণয় করতে পারেননি। মাস্তুলের যুদ্ধের ব্যাপারে ইমাম তাবারি রাহি. বলেছেন, এ যুদ্ধে পানির উপর রক্ত প্রাধান্য পেয়েছিল।

তবে, নবুয়তের যামানার দশ বছরের মোট ৬৩ টি যুদ্ধ এবং খোলাফায়ে রাশেদার যামানার সকল যুদ্ধ মিলে বিশ বছরে মোট শহীদদের সংখ্যা বিশ হাজারের উপর হবে, সন্দেহ নেই।

উপরের পরিসংখ্যান থেকে কয়েকটি বিষয় বুঝে আসে-

১. 'খাইরুল কুরুন' সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের মাঝে প্রতি বছর গড়ে প্রায় এক হাজার শহিদ হয়েছেন, যারা দ্বীনের জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। সুতরাং, যারা মনে করে বা বলে, 'তরবারি দ্বারা ইসলাম প্রচার হয়নি।'-এটি মূলত একটি ঐতিহাসিক 'ডাহা মিথ্যা কথা'; ইসলামের বিরুদ্ধে জ্বলজ্যান্ত মিথ্যাচার, শহিদানের রক্তের অবমাননা, ইতিহাস বিকৃতি, উম্মাহ্‌কে বিভ্রান্ত ও জিহাদ বিমুখ করার হীনপ্রচেষ্টা মাত্র।

২. অন্যদিকে, মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে কুফ্ফারদের লক্ষ লক্ষ নিহত হয়েছে। এই স্বল্প সময়েই অর্ধ পৃথিবী জয় হয়েছে। কুফ্ফারদের উপর মুসলিমদের আধিপত্য ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩. এমনকি উমাইয়া খিলাফতের সময় ৪১-১৩২ হিজরি (৬৬১-৭৫০ ঈসায়ী) মুসলিম ভূমির বিস্তৃতি প্রায় ১,৫০,০০,০০০ (দেড় কোটি) বর্গ কিমি হয়ে যায়। আল্হামদুলিল্লাহ।

৪. মাত্র বিশ বছরে বিশ হাজার শহীদানের রক্তের বিনিময়ে বিশ্বব্যাপী শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হয়। সারা বিশ্বে মুসলমানরা পরিপূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে। পৃথিবীর কোথাও কোনো একজন মুসলিমকে নির্যাতিত হতে হবে বা হত্যা করা হবে, এটা ছিল অসম্ভব!! কিংবা কোথাও কোনো একজন মুসলিম মা-বোনের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাবে, (ধর্ষণ করবে এটা তো ছিল বহু দূরের কথা) এটা তখন ছিল অকল্পনীয়!!!

দুটি উদাহরণ দেখুন-

এক. উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের শাসনামলে ৯০ হিজরি সনে একটি আরব বণিক কাফেলা সরনদ্বীপ (সিলন/বর্তমান শ্রীলংকা) থেকে আঠারটি জাহাজে করে ইরাকে ফেরার পথে সিন্ধুর দেবল বন্দর (বর্তমানে পাকিস্তানের করাচী) অতিক্রম করার সময় একদল দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। দস্যুরা জাহাজগুলোকে লুট করে ও মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুদের দেবলে নিয়ে কারাগারে আটকে রাখে। তখন চিঠি মারফত বন্দী এক বোনের আহ্বানে ৯২ হিজরি সনে হাজ্জাজ তার চাচাতো ভাই ও জামাতা মুহাম্মাদ বিন কাসিম আস্ সাকাফির নেতৃত্বে সিন্ধু অভিমুখে বার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদ বিন

কাসিম পথিমধ্যে অনেক অঞ্চল জয় করে অবশেষে ৯৩ হিজরীতে দেবল নগরী ও দেবল দুর্গ জয় করে মুসলমান নর-নারী আর শিশুদের উদ্ধার করেন এবং অবশেষে সিন্ধু বিজয় করেন।

দুই. বাইজান্টাইন সম্রাট থিওফেল (Theophilos) আব্বাসী রাষ্ট্রের সীমান্ত নগরী যিবাতরায় হামলা চালিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালানোর পাশাপাশি অনেক মুসলিম মা-বোনকে বন্দি করে নিয়ে যায়। জনৈক হাশিমি বোন রোমানদের হাতে বন্দি অবস্থায় 'হায় মু'তাসিম!' বলে চিৎকার করেছে, খলিফা মুতাসিম (২১৮-২২৭ হিজরি) যখন এই সংবাদ জানতে পারলেন, তখন সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন ও অস্থির চিত্তে বলে উঠলেন, লাব্বাইক! আমি উপস্থিত আছি, হে আমার বোন। এরপর তিনি নফীরে আম-এর ঘোষণা দেন এবং যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন। রোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত নগরী 'আম্মুরিয়া'কে পঞ্চান্ন দিন অবরোধ করে রাখার পর মুজাহিদ বাহিনী তা জয় করে এবং অপহৃত হাশিমি মুসলিম বোনকে উদ্ধার করে।
এই ছিল তখনকার মুসলিমদের প্রতাপ ও ক্ষমতার দৃষ্টান্ত; এই ছিল তৎকালীন মুসলিমদের শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থা।

অতঃপর যখন মুসলিম খলিফারা 'নববী মানহাজ' হতে বিচ্যুত হয়ে দুনিয়ার মোহ আর বিলাসিতায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে, জিহাদের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করতে শুরু করে, কুদরতের নিয়ম মেনেই তখন 'সুন্নাতুল্লাহ' কার্যকর হওয়া শুরু হয়-

إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ
وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ٣٩

"তোমরা যদি (তাঁর পথে জিহাদের জন্য) বের না হও, তাহলে (এ জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা বদল করে দিবেন, তোমরা তার কোনই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" (০৯ সূরা তাওবা: ৩৯)

মুহাম্মাদ আলী সবূনী (রহঃ) উপর্যুক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন:

[إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما] أى ان لا تخرجوا الى الجهاد مع رسول الله ، يعذبكم الله عذابا اليما موجعا ، باستيلاء العدو عليكم في الدنيا ، وبالنار المحرقة في الاخرة ،

"যদি তোমরা যুদ্ধে বের না হও, তিনি তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি দেবেন" অর্থাৎ তোমরা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জিহাদে বের না হও, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন, দুনিয়াতে তোমাদের উপর শত্রুকে চাপিয়ে দিয়ে। আর পরকালে জ্বলন্ত আগুন দিয়ে। [সফওয়াতুত তাফাসীর, দেখুন:উক্ত আয়াতের তাফসীর]

عَنْ اِبْنِ عُمَر قَالَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْل، اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتىّٰ تَرْجِعُوْا اِلىٰ دِيْنِكُمْ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, "যখন তোমরা 'ঈনাহ' পদ্ধতিতে (এক ধরনের সুদ ভিত্তিক ব্যবসা) ক্রয় বিক্রয় এবং ব্যবসা বাণিজ্যে পুরাপুরি মশগুল হয়ে যাবে এবং গরুর লেজ ধরে খেত খামারে মগ্ন হয়ে যাবে আর জিহাদ করা ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এমন

অপমান/জিল্লতি চাপিয়ে দিবেন, যা ততক্ষণ পর্যন্ত দূর হবে না যতক্ষণ না তোমরা আপন দ্বীনের (জিহাদের) দিকে ফিরে আসবে।" (আবু দাউদ ৩৪৬২, বায়হাকী ১০৪৮৪, জামেউল আহাদীস ১৬০৩, কানযুল উম্মাল ১০৫০৩, বুলুগুল মারাম ৮৪১)

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْل، مَا تَرَكَ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اِلَّا ضَرَبَهُمْ اللهُ بِذِلٍّ وَلَا أَقَرَّ قَوْمٌ الْمُنْكَرَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ اِلَّا عَمَّهُم اللهُ بِعِقَابٍ

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন যে, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি ﷺ বলেছেন, যদি কোন জাতি জিহাদ ছেড়ে দেয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সবার উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন। আর যদি কোন জাতি তাদের মধ্যে কোন অন্যায়কে আশ্রয় দেয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করেন।" (জামে'আ আহাদীস ২৭০৩৫, মুজামুল আওসাত ৩৮৩৯, কানযুল উম্মাল ৮৪৪৭)

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا " . فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ " بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ " . فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ " حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ " .

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এমন এক সময় নিকটবর্তী, বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী তোমাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধে তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য) একে অপরকে এভাবে আহ্বান করবে, যেভাবে আহারকারী লোকেরা খাদ্যপাত্রের দিকে একে অপরকে

ডাকাডাকি করে।" (এ কথা শুনে) কেউ জিজ্ঞাসা করল, সেদিন কি সংখ্যায় কম থাকার কারণে আমাদের এ অবস্থা হবে? তিনি ﷺ উত্তর দিলেন, "না; বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায় অনেক বেশি থাকবে, কিন্তু তোমরা বন্যায় ভেসে আসা আবর্জনার (/খড়কুটোর মতো প্রাণহীন ও ওজনহীন) হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় উঠিয়ে নিবেন, (এর বিপরীতে) তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহন' ঢেলে দিবেন।" কেউ জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, 'ওয়াহন' অর্থ কি? তিনি ﷺ উত্তরে বললেন,"দুনিয়াপ্রীতি এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।" (আবু দাউদ-৪২৯৭, বায়হাকী)

سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٢٣

"আর এটাই আল্লাহ্‌র সুন্নত (রীতি), যা পূর্ব থেকে চালু আছে। আর তুমি আল্লাহ্‌র সুন্নতের মধ্যে কোনো পরিবর্তন পাবেন না।" (সূরা ফাত্‌হ ৪৮:২৩)

আর এভাবে জিহাদের ব্যাপারে গাফলতী ও শিথিলতার অনিবার্য ফলস্বরূপ মুসলিম বিশ্বে একের পর এক ট্রাজেডি ঘটতে থাকে, একের পর এক খিলাফতের উত্থান ও পতন ঘটতে থাকে, শেষ পর্যন্ত ১৯২৪ সালে উসমানী খিলাফতের পতনের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী বরকতময় ইসলামী শাসনের পতন ঘটে। নিকষ কালো আঁধারে ছেয়ে যায় পুরো মুসলিম বিশ্ব। মুসলিমদের উপর নেমে আসে কুফ্‌ফারদের একের পর এক আগ্রাসন, যার একটি অপরটি হতে বেশি মারাত্মক, একটি আরেকটি হতে অধিক রক্তক্ষয়ী, যা বর্তমান সময় পর্যন্ত চলমান।

প্রিয় ভাই, ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাস হতে অল্প কিছু ট্রাজেডির দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন-

- বাইতুল মোকাদ্দাসকে মুসলমানদের হাত হতে ছিনিয়ে নিতে রোমান ক্যাথলিক চার্চের পোপ দ্বিতীয় আরবানের আহ্বানে তিন লক্ষ সৈন্যের বহুজাতিক খ্রিস্টান বাহিনী ফ্রান্স হতে বাইতুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। একচল্লিশ দিন অবরোধের পর ক্রুসেডাররা আল কুদ্স জয় করে এবং ব্যাপক গণহত্যা চালায়। মুসলমানদের রক্তে কুদ্স নগরী প্লাবিত হয়। প্রায় **সত্তর হাজার** সাধারণ মুসলমান ক্রুসেডারদের হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়। ৪৯২ হিজরি সনের শাবান মাসে (১০৯৯ ঈসায়ীর জুলাই মাসে) মর্মান্তিকভাবে বাইতুল মুকাদ্দাসের পতন ঘটে।

- ৬১৬ হিজরি সনের ৪ জিলহজ্জ (১২২০ ঈসায়ীর ফেব্রুয়ারি মাসে) চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে তাতাররা বুখারায় প্রবেশ করে সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। দুদিনের আগের সুবিশাল ও সুসমৃদ্ধ বুখারা নগরী পরিণত হয় বিধ্বস্ত এক ধ্বংসস্তুপে, যেন গতকালও সেখানে কেউ বসবাস করেনি। ৬১৭ সালের মুহাররাম মাসে (১২২০ ঈসায়ীর মার্চ মাসে) একই ভাবে সমরকন্দকেও ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা হয়। এরপর তাতাররা মুসলমানদের অন্যান্য ভূমিগুলোতে একের পর এক ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে।

  চেঙ্গিস খান যখন মুসলিম ভূ-খণ্ডে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল, মুসলিম বিশ্বের অভিভাবক আব্বাসি খলিফা নাসির লি দ্বীনিল্লাহ তখন ব্যস্ত জনসাধারণের উপর জুলুম করে তাদের সম্পদ লুণ্ঠনে এবং নারী ও ভোগবিলাসের মধ্যে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে!

- এরপর এলো ৬৫৬ হিজরি। এ বছরেই **১২** মুহাররাম মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চেঙ্গিস খানের পৌত্র তাতার শাসক হালাকু খান পুরো বাহিনী নিয়ে বাগদাদে উপস্থিত হয়। তার বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ। হালাকু খানের উজির ছিল গাদ্দার নাসিরুদ্দিন তুসি। অন্যদিকে, বাগদাদের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য, অশ্বারোহী সৈন্য দশ হাজারও হবে না। রাফিজি উজির আলকামির প্ররোচনায় খরচ কমাতে খলিফাতুল মুসলিমীন সেনাবাহিনীর সংখ্যা এক লক্ষ থেকে দশ হাজারে কাট-সাট করে নিয়ে এসেছিল আগেই। (জিহাদের প্রতি তৎকালীন খলীফাতুল মুসলিমীনের কেমন অবহেলা ছিল, তা লক্ষ্য করার মত বিষয়!!) এরপর হালাকু বাহিনী পুরো বাগদাদে চল্লিশ দিন ব্যাপী স্মরণকালের ইতিহাসের অন্যতম নৃশংস গণহত্যা চালায়। সর্বমোট **বিশ লক্ষ** নারী-পুরুষ, শিশু-তরুণ-বয়োবৃদ্ধ সকলকেই হত্যা করা হয়। বাগদাদের অলি-গলিতে রক্তের বন্যা বয়ে যায়। আমিরুল মুমিনীনকে বস্তায় ভরে পদদলিত করে হত্যা করা হয়।

- ৮০৩ হিজরি সনে তাতার তৈমুর লং আলেপ্পোকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে দামেশক অভিমুখে রওনা হয়। অতঃপর তৈমুর লং দামেশকে প্রবেশ করে আলেপ্পোর মতো দামেশকেও প্রচুর ধ্বংসযজ্ঞ ও রক্তপাত ঘটায়।

- ৮৯৭ হিজরি সনের ২ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৪৯২ ঈসায়ীর ২ জানুয়ারি আন্দালুসের (মুসলিম স্পেনে) শেষ ইসলামি দুর্গ গ্রানাডার পতন ঘটে। স্পেনের পতনের পর সেখান থেকে বিতাড়িত করা হয় প্রায় ত্রিশ লক্ষ মুসলমানকে। অপরদিকে যারা স্প্যানিশ খ্রিস্টানদের নির্মম গণহত্যার শিকার হয়, তাদের সংখ্যাও প্রায় **ত্রিশ লক্ষের** মত।

- তাতার আগ্রাসনের পর এক শতাব্দীর মধ্যে তাতাররা প্রায় সবাই মুসলমান হয়ে যান। অতঃপর, তাতার মুসলিমরা একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রাশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইসলামের পতাকা উড্ডীন রেখেছিল। এরপর তাদের মধ্যেও যখন জিহাদের ব্যাপারে দুর্বলতা, নিজেদের মধ্যে বিভাজন ও কতিপয় গাদ্দারের প্রকাশ ঘটে, এই সুযোগে কুফ্ফার, খোদার দুশমন রাশিয়া তাতার মুসলিমদের এলাকাগুলো একে একে দখল করতে থাকে। এবং দখলকৃত এলাকাগুলোতে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ ইত্যাদি ঘটতে থাকে। দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা, বাড়িঘর ধ্বংস করা, মসজিদগুলোকে ভেঙে সেগুলোকে গির্জা, ঘোড়ার আস্তাবল, সেনাক্যাম্প, নাট্যশালা, মদের আড্ডা ইত্যাদিতে পরিণত করা, দ্বীনি মাদরাসা-মক্তবগুলোকে খ্রিস্টধর্মের প্রচারকেন্দ্র বানানো, মুসলমানদের উপর দুঃসাধ্য করের বোঝা চাপানো, খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা ইত্যাদি- এরূপ বহুবিধ পন্থায় তাতার মুসলমানদের উপর রাশিয়ান কুকুররা নির্যাতন করত।
- সোভিয়েত আমলে মুসলিমদের উপর অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সোভিয়েত নেতা স্টালিনের শাসনকালেই **প্রায় ১১ মিলিয়ন (এক কোটি দশ লক্ষ)** মুসলিমকে হত্যা করা হয়।

- বর্তমানে চীনের স্বায়ত্তশাসিত শিনচিয়াং প্রদেশে (উইঘুরে) পুনঃশিক্ষার নাম দিয়ে শুধু **১০ লাখ** উইঘুর মুসলিমকে রাজনৈতিক বন্দিশিবিরে রাখা হয়েছে। সবমিলিয়ে **২০ লাখ** মুসলিমকে উগ্রপন্থী সন্দেহে আটক রাখা হয়েছে দীর্ঘদিন। সেখানে বন্দীদেরকে ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করছে, যৌন হয়রানি করছে, মদপান ও শূকর খেতে বাধ্য করছে। বন্দিদেরকে তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে দিচ্ছে না।
- **ভারতীয় মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসন:**

- মুসলমানরা প্রায় ছয়শত বছর হিন্দুস্তান তথা ভারতবর্ষ শাসন করেছে। কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের জিহাদবিমুখতা ও দুর্বলতার সুযোগে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের উপর গণহত্যা, গণধর্ষণ, গুম, মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির বানানো ইত্যাদি নানাভাবে মুসলিমদের উপর আগ্রাসন চালাচ্ছে।
- ১৯৪৬ এর কলকাতা ম্যাসাকার এর দুই মাস পর হত্যাযজ্ঞ চালানো হয় বিহারে। উনিশ দিনের দাঙ্গায় হত্যা করা হয় **বিশ হাজারের** উপর মুসলিমকে।
- ১৯৪৭ এর দেশভাগের সময় হিন্দুস্তান জুড়ে ভয়াবহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দেয়। ভারতের বঞ্চিত-নির্যাতিত মুসলিমরা নিজেদের জান-মাল নিয়ে হাজার হাজার মাইলের অনিশ্চিত পথে পাড়ি জমায় পাকিস্তানের দিকে। এই দীর্ঘ পথে সংঘবদ্ধ হিন্দুত্ববাদী গেরোয়া সন্ত্রাসীরা হাজার হাজার মুসলিমদেরকে হত্যা করে, লুটপাট করে, মা-বোনদের ধর্ষণ করে। যাওয়ার পথে ট্রেনেও অভিশপ্ত হিন্দুরা আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এই দাঙ্গায় **১ লক্ষ ৩৭ হাজার** মুসলমান শহীদ হয়।
- ১৯৪৭ সালেই ভারত সরকার কাশ্মীরের শাসক মহারাজাকে সহায়তা করতে বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে দেয়। তারা ঘোষণা করে, যারা পাকিস্তানে যেতে ইচ্ছুক তাদের সহায়তা দেয়া হবে। মুহাজিরদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমা হতে আহ্বান জানানো হয়। যখন অনেক মুসলমান মুহাজির শিবিরে একত্রিত হলেন, তখন তাদের উপর চালানো হয় নৃশংস হামলা। এ ঘটনায় **৫ লক্ষ** মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। আর সমপরিমাণ মুসলমান পাকিস্তানে হিজরত করতে সক্ষম হয়। মালাউন হিন্দুরা বহু মুসলিম নারীকে নির্যাতন করে। খুন, ধর্ষণ, এমনকি পরিবারের সামনে নৃশংস ভাবে তাদের স্তন কেটে ফেলে। এভাবে কয়েক লক্ষ মুসলিমকে শহীদ করা হয়।

➢ এরপর ছোট-বড় অনেকগুলো দাঙ্গা সংগঠিত হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ১৯৪৭ সালে হায়দরাবাদে অপারেশন পোলোর পরে মুসলমানদের ব্যাপকহারে হত্যা, ১৯৫০ সালে বরিশাল দাঙ্গা ও ১৯৬৪ সালে পূর্ব-পাকিস্তান দাঙ্গার পরে কলকাতায় মুসলিম দাঙ্গা, ১৯৬৯ সালের গুজরাত দাঙ্গা, ১৯৮৪ ভীভান্দি দাঙ্গা, ১৯৮৫ গুজরাত দাঙ্গা, ১৯৮৯ সালের ভাগলপুর দাঙ্গা, বোম্বাই দাঙ্গা, ১৯৮৩ সালে নেলি এবং ২০০২ সালে গুজরাতের দাঙ্গা, ২০১৩ সালে মুজাফফরনগর দাঙ্গা ও ২০২০ সালে দিল্লি দাঙ্গা ইত্যাদি। এসকল দাঙ্গায় **হাজার হাজার** মুসলিমদের গণহত্যা আর গণধর্ষণ করে হিন্দুত্ববাদী মালাউনরা।

➢ ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল আরএসএস এবং এর সহযোগী সংগঠনের লাখ লাখ হিন্দু ভারতের উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অযোধ্যা শহরে অবস্থিত বাবরি মসজিদকে শহীদ করে দেয়।

- **বসনিয়া গণহত্যাঃ** ১৯৯৪-৯৫ সালে বসনিয়ার যুদ্ধে মুসলিমরা নির্মম গণহত্যার শিকার হয়। প্রায় ৩১,৫৮৩ জন মুসলমানকে হত্যা করা হয়, প্রায় ২০,০০০ মত মা-বোনকে ধর্ষণ করা হয়।

  সারায়েভো গণহত্যায় বলির শিকার হয় প্রায় ১,৫০০ শিশুসহ ১০,০০০ এর মত মুসলিম।

  সেব্রেনিৎসা গণহত্যার সময় মোট ৮,৩৭২ জন বসনিয়াক মুসলিমদের হত্যা করা হয়।

  ২০০৪ সালে যুদ্ধ-অপরাধ আদালতের তথাকথিত রিপোর্টে বলা হয়, ২৫ থেকে ত্রিশ হাজার বসনীয় মুসলিম নারী ও শিশুকে জোর করে অন্য অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং স্থানান্তরের সময় তাদের এক বিপুল অংশ

ধর্ষণ ও গণহত্যার শিকার হয়। গণহত্যা ও নারী-শিশুদের ধর্ষণের সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলে অন্যান্য রিপোর্টে বলা হয়েছে।

বসনিয়ার মুসলমানদের উপর এইসব হত্যাকাণ্ড ছিল সুপরিকল্পিত ও সংঘবদ্ধ অভিযানের ফসল। বসনিয়ার যুদ্ধ চলাকালে সার্ব সেনা ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা কখনও কখনও কোনো একটি অঞ্চলে হামলা চালানোর পর সেখানকার সমস্ত পুরুষকে হত্যা করতো অথবা অপহরণ করতো এবং সেখানকার নারীদের ধর্ষণের পর তাদের হত্যা করতো। তারা বহুবার গর্ভবতী নারীর পেট ছুরি দিয়ে কেটে শিশু সন্তান বের করে ওই শিশুকে গলা কেটে হত্যা করেছে মায়ের চোখের সামনে এবং কখনওবা আরো অনেকের চোখের সামনেই। আর এ ধরনের হত্যাকাণ্ড ও নৃশংস পাশবিকতার বহু ঘটনা ঘটানো হয়েছে হল্যান্ডের তথাকথিত শান্তি(?)রক্ষীদের চোখের সামনেই। এমনকি মাত্র ৫ ছয় মিটার দূরে যখন সার্ব সেনারা এইসব পাশবিকতা চালাতো তখনও এই সকল তথাকথিত শান্তি(?)রক্ষীরা কেবল বোবা দর্শকের মতই নীরব থাকতো ও হেঁটে বেড়াতো।

- যুগ যুগ ধরে চলে আসা আরাকানের মুসলিমদের উপর বৌদ্ধ সন্ত্রাসী কর্তৃক নির্যাতন, হাজার হাজার রোহিঙ্গা মুসলিমদের গণহত্যা, গণধর্ষণ, শিশুদের পুড়িয়ে হত্যা করা, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে গ্রামের পর গ্রাম বিরান করে দেয়ার ঘটনা আমাদের থেকে দূরবর্তী নয়।

- এছাড়াও বিগত কয়েক দশকে আমেরিকা ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গ পশ্চিমা ক্রুসেডার কর্তৃক মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেওয়া আফগানিস্তান যুদ্ধ, ইরাক যুদ্ধ, সিরিয়া যুদ্ধ, ইয়েমেন যুদ্ধ, পূর্ব আফ্রিকা ও পশ্চিম আফ্রিকার মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মুসলিম নিহত হয়েছে।

....

প্রিয় ভাই! মুসলিমদের উপর যুগে যুগে গণহত্যার ইতিহাসের আলোচনা শেষ হবার নয়।

আশাকরি, এতক্ষণের আলোচনায় নিচের কয়েকটি বিষয় আমাদের সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে-

এক. নবুয়তের যামানা হতে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদার ত্রিশ বছর, যখন ইসলামী জিহাদের স্বর্ণযুগ ছিল এবং মুসলিমরা তাদের জান-মালের সর্বস্ব জিহাদের জন্য ব্যয় করে সারা বিশ্বে ইসলামী খিলাফাহ কায়েম করলেন আর জীবন দিতে হল মাত্র বিশ থেকে ত্রিশ হাজার শহীদানের।

দুই. আর যখন আমরা দুনিয়ার মহব্বত আর মৃত্যুর ভয়ে জিহাদের ব্যাপারে শিথীলতা ও জিহাদ বিমুখতা প্রদর্শন করা শুরু করলাম, মৃত্যু থেকে পলায়ন করার চেষ্টায় লিপ্ত হলাম, মৃত্যুই তখন আমাদের উপর চেপে বসল; মুসলিম জাহানের উপর এক এক করে যে সকল বিপর্যয় আসতে লাগল, তাতে এই পরিমান জান-মালের ক্ষতি সাধিত হল যার হিসেব করা অসম্ভব!!!

তিন. ইসলামের চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসে যুগে যুগে আমরা গণহত্যার শিকার হয়েছি। বিপর্যয়ের মুহূর্তগুলোতে আমাদের মধ্যে অবশ্যই জিহাদ করতে সক্ষম বালেগ পুরুষ ছিল। তখন যদি আমরা জিহাদের ব্যাপারে 'প্রয়োজন পরিমাণ' যত্নশীল থাকতাম, তাহলে হয়ত আমাদেরকে এমন পরিণতি লাভ করতে হত না; হয়ত কুফ্ফাররা আমাদের উপর এমন নৃশংস গণহত্যা চালানোর সাহস পেত না, মা-বোনদের বে-ইজ্জতি করার মত দুঃসাহস দেখাতে পারত না, আমাদের ভূমিগুলোর দিকে তাদের লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারতো না; যেমনটি পারেনি ইসলামের

প্রাথমিক যুগে। হায়! গণহত্যার শিকার হয়ে আমাদের তো মরতে হলই, যদি আমরা বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে মরতাম!!

প্রিয় ভাই, কাপুরুষতা হায়াত বৃদ্ধি করে না, কেবলই জিল্লতি ও লাঞ্ছনা বয়ে নিয়ে আসে। অপরদিকে, বীরত্ব হায়াতকে কমাতে পারে না। তবে দুনিয়া ও আখিরাতে ইজ্জত ও শুভ পরিণতি বয়ে নিয়ে আসে।

তাহলে ভাই, কেন আমরা জিহাদ করবো না??? মরতেই যখন হবে, কাপুরুষতার মৃত্যু কেন?? কেন অপমান আর অপদস্তির মৃত্যু??? হয়ত আমরা দুনিয়ার বুকে শরীয়ত কায়েম করব, নতুবা শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে অমরত্ব লাভ করব। দুটি কল্যাণের একটি অবশ্যই লাভ করব, ইনশাআল্লাহ।

চার. কুফ্ফাররা কেন আমাদের উপর আগ্রাসন চালায়? কেন আমাদের উপর গণহত্যার পথ বেছে নেয়? কেন আমাদেরকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়?? কী আমাদের অপরাধ? কুফ্ফারদের কাছে আমাদের অপরাধ একটাই! আমরা মুসলিম, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর। অন্যরা যখন বলে আমি ইহুদী, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু কিংবা নাস্তিক; তখন আমরা ঘোষণা দেই যে, আমরা মুসলমান।

ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ

"তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ!" (সূরা হজ্জ ২২:৪০)

وَمَا نَقَمُوا۟ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ٨

"তারা (কুফ্ফাররা) তাদেরকে (মুসলিমদেরকে) শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।" (সূরা বুরুজ ৮৫:৮)

পাঁচ. আমাদের দ্বীন, আমাদের ঈমান-আমল, মসজিদ-মাদরাসা-খানকাহসহ অন্যান্য দ্বীনী প্রতিষ্ঠানসমূহ হেফাযতের জন্যও জিহাদ করা একান্ত জরুরী। জিহাদ না করলে এমন একটি সময় আসবে যখন আমাদের মসজিদ, মাদরাসা আর খানকাহগুলোতে তালা দেয়া হবে, কিংবা ধ্বংস করে দিয়ে ইতিহাস বানিয়ে দেয়া হবে, যেমনটি আমরা ইতিহাসের পাতায় পাতায় বারবার দেখেছি।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন-

وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًاۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠

"আল্লাহ্ যদি মানুষদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত (ইসলাম আগমনের পূর্বে) নাসারা সংসার বিরাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় এবং (ইসলাম আগমনের পর) মসজিদসমূহ-যাতে খুব বেশী স্মরণ করা হয় আল্লাহ্র নাম। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন যে আল্লাহ্কে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।" (সূরা হজ্জ ২২: ৪০)

ছয়. আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা জিহাদ করি বা না করি- আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আমাদের দুশমনরা আমাদেরকে ধর্মত্যাগ কিংবা দুনিয়াত্যাগ দুটোর একটি বেছে না নেয়া পর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে, সুযোগমত গণহত্যা চালাতেই থাকবে, যেমনটি আমাদের প্রভু রব্বে রাহীম আমাদেরকে অবহিত করেছেন-

وَلَا يَزَالُونَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَـٰعُوا۟ ۚ

“আর তারা সবসময় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়।” (সূরা বাকারা ২:২১৭)

আর তাই কুফ্ফাররা চায়ও এটি যে, আমরা অস্ত্র ত্যাগ করে নিরস্ত্র হয়ে বসে থাকি। আর তারা তাদের হীন লিপ্সা চরিতার্থ করুক!

وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَٰحِدَةً ۚ.............وَخُذُوا۟ حِذْرَكُمْ ۗ

“কাফেররা চায় যে, তোমরা কোনরূপে (অস্ত্র/জিহাদ থেকে) অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে।........আর তোমরা অস্ত্র ধারণ কর।” (০৪ সূরা নিসা: ১০২)

প্রিয় ভাই! আমাদেরকে এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা কি কুফ্ফারদের চাহাদ-অস্ত্রত্যাগ, ধর্মত্যাগ কিংবা দুনিয়াত্যাগ, তিনটির কোনো একটাকে বেছে নিব, নাকি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে দ্বীন রক্ষার্থে আমরণ লড়াই করব???

সাত. সারকথা হল, জিহাদের অপর নাম জীবন। যুদ্ধের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের হায়াত; শান্তি-নিরাপত্তা, ইজ্জত-সম্মান আর স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব লাভের মাধ্যমে দুনিয়াতে; শাহাদাত ও চিরস্থায়ী জান্নাতুল ফিরদাউস লাভের মাধ্যমে পরকালে।

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢١٦

"তোমাদের উপর যুদ্ধ **ফরয** করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। হতে পারে একটা বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দীয়, অথচ তোমাদের জন্য তা অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলাই জানেন, তোমরা জান না।" (২ সূরা বাকারা: ২১৬)

একজন মুসলমানের রক্তের দাম কতটুকু?

দুনিয়াব্যাপী আজ চারিদিকে কেবলই মুসলিমদের আর্তনাদ আর আহাজারি শুনা যাচ্ছে। দিকে দিকে কেবল মুসলিমদের রক্তস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। মা-বোনদের বে-ইজ্জতি করা হচ্ছে। যেন মুসলিমরা মানুষই নয়; যেন 'মানুষ' শব্দটি মুসলিমদের জন্য নয়; যেন 'মানবতা' কথাটি তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়; মুসলিমদের যেন মানবাধিকার থাকতে নেই।

অথচ ভাই, একজন মুসলিমের রক্তের দাম আল্লাহ্ পাকের কাছে কতটুকু জানেন কি? জানেন কি একজন মুমিনের কী দাম তার রবের নিকট?

ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك

একদিন ইবনু উমার (রাঃ) বাইতুল্লাহ বা কা'বার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কতই না ব্যাপক ও বিরাট! তুমি কতইনা সম্মানিত কিন্তু তোমার চেয়েও মু'মিনের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে অনেক বেশি।" [হাসান, মিশকাত (৫০৪৪) , তা'লীকুর রাগীব (৩/২৭৭)]

আবূ বারযা আল-আসলামী (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে একই রকম বর্ণিত আছে।

عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله " .

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন : 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলার মতো একটি মানুষ অবশিষ্ট থাকতে কিয়ামত হবে না।" (সহীহ মুসলিম-২৭০)

অর্থাৎ এই আসমান যমীনে যা কিছু আছে, তার সবকিছু মিলে সেই দাম রাখে না, যেই দাম আল্লাহ্ পাকের নিকট একজন আদনা থেকে আদনা মুমিনের জন্য রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন,

لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق

“অন্যায়ভাবে একজন মুমিনের রক্তপাত অপেক্ষা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহ্‌র নিকট তুচ্ছ।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-২৬১৯; সুনানে তিরমিজি, হাদীস নং-১৪৫২,১৪৫৩)

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا

“ঐ সত্ত্বার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, কোনো মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা আল্লাহ্‌র কাছে পৃথিবী ধ্বংস হওয়া অপেক্ষাও গুরুতর।” (সুনানে আন-নাসায়ী)

বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে একজন মুসলিমের রক্তের দাম এতবেশি যে, একজন মুসলমানকে মহাবিশ্বের সকল মাখলুক মিলে যদি অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে আল্লাহ্ তা‘আলা মহাবিশ্বের সকল মাখলুককেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

তাহলে ভাই, আমরা কি বুঝতে পেরেছি, আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে আমাদের, একজন মুসলমান ভাই কিংবা একজন মুসলিম বোনের কী মর্যাদা??

প্রিয় ভাই! একটি প্রশ্ন:

যদি পৃথিবীর কোথাও কোনো একজন মুসলিমও কুফ্‌ফার কর্তৃক বন্দী হয়, ঐ মুসলমানকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত জিহাদ করতে সক্ষম প্রতিটি মুসলমানের উপর যদি ফরযে আইন হয়ে যায়; তাহলে প্রশ্ন হল, যদি

পৃথিবীর কোথাও কোনো একজন মুসলিমকে কুফ্ফাররা হত্যা করে, এই ক্ষেত্রে হুকুম কী?

আমাদের কী মনে হয়, এক্ষেত্রে কী হুকুম হতে পারে?

উত্তর: এক্ষেত্রে জিহাদ করে প্রতিশোধ নেওয়াটা অবশ্যই ফরজে আইন হবে। যেমনটি আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে হুদাইবিয়ার ঘটনায় দেখতে পাই যে, উসমান রাদি. এর হত্যার সংবাদ শুনা মাত্র বলে উঠেনঃ

لَا نَبْرَحُ حَتّٰى نُنَاجِزَ الْقَوْمَ

[ابن كثير ,البداية والنهاية ط الفكر ,১৬৭/৪]

অর্থাৎ "(যদি এ খবর সত্য হয়ে থাকে) আমরা এখান থেকে কিছুতেই সরে যাব না যতক্ষণ না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি।"

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত ১৪০০ (মতান্তরে ১৫০০) সাহাবীর থেকে মৃত্যুর বাইয়াত নেন, এই মর্মে- 'হয়ত শরীয়ত, নয়ত শাহাদাত'; স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এই বাইয়াতের উপর সন্তুষ্ট হয়ে এই আয়াত নাযিল করেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا

"নিশ্চয় যারা আপনার কাছে বাই'আত গ্রহণ করে তারা তো আল্লাহ্রই হাতে বাই'আত গ্রহণ করে। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। তারপর যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করার পরিণাম বর্তাবে তারই উপর এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তবে তিনি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দান করেন। (সূরা ফাত্হ ৪৮:১০)

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا

"অবশ্যই আল্লাহ মুমিনগণের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নীচে আপনার কাছে বাই'আত গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জেনে নিয়েছেন; ফলে তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয়ে পুরস্কৃত করলেন।" (সূরা ফাত্হ ৪৮:১৮)

তাহলে ভাই, আপনিই বলুন,
আজ পৃথিবীতে কি একজন মুসলিমও কুফ্ফারদের হাতে বন্দী হয়নি?
একজন মুসলমানকেও কি কুফ্ফাররা পৃথিবীতে হত্যা করেনি?
ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, মায়ামানমারে কী একজন মুসলমানও শহীদ হয়নি? তাহলে বর্তমান পৃথিবীতে জিহাদ করতে সক্ষম সকল মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হবে না কেন?

তাই, আল্লাহ্ পাকের হুকুম, একজন মুসলমানের রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য যদি সমস্ত মুসলিম উম্মাহ্র প্রত্যেকেরই রক্ত দিতে হয়, তবু তাই দিতে হবে। একজনের জন্য যদি সকলকেই জীবন দিতে হয় তবুও দিতে হবে। মুসলিমের প্রতিটি রক্তের ফোটার হিসেব রাখতে হবে। একজন মুসলমানের একটি রক্তের ফোঁটার জন্য আমাদের সকলকে জিহাদ করতে হবে। প্রয়োজন পড়লে দুনিয়ার সমস্ত শক্তি ও অর্থ ব্যায় করতে হবে। একজন মুসলমানকে হত্যা করার পিছনে যদি একশ কিংবা এক হাজার কিংবা এক কোটি কিংবা কোনো একটি জাতির সকলের হাত থাকে, তবে সকলকেই হত্যা করতে হবে। এটিই আল্লাহ্র বিধান।

বাইয়াতে রিযওয়ানের ঘটনাটা আমরা আবারো একটু স্মরণ করি। একজন উসমান রা. এর হত্যার সংবাদ (যা কিনা গোজব ছিল, তা) পাওয়া মাত্রই

তাঁর রক্তের বদলা নিতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং ১৪০০ সাহাবী শাহাদাতের উপর বাইয়াত গ্রহন করেছিলেন, একজনের রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ১৪০০ জন রক্ত দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। আর আল্লাহ্ পাকও সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন।
সুবহানাল্লাহ!!! একজন মুসলিমের রক্তের বদলা নেয়ার জন্য যদি সকল সাহাবী যুদ্ধের শপথ নিয়ে থাকেন, মউতের উপর বাইয়াত গ্রহণ করেন, তাহলে ভাই, বর্তমান যামানায় লক্ষ লক্ষ মুসলিমের রক্তের বদলা নেয়ার জন্য আমাদের তাহলে কী করা উচিত?? লক্ষ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমহানীর বদলায় আমাদের কী করা উচিত???
বাইয়াতে রিযওয়ানের ঘটনায় আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয়- আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এজন্য কোনো তিরস্কার করেননি যে, হে নবী! আপনি কেন একটি সংবাদ সত্য/মিথ্যা যাচাই না করেই যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে বসলেন?? বরং উল্টো মুসলমানদের জিহাদের এই জযবাকে নিজের সন্তুষ্টি দ্বারা পুরস্কৃত করলেন। যার জন্য যুদ্ধের এই বাইয়াত 'বাইয়াতে রিযওয়ান' হিসেবে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করে।
এঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয়, জিহাদ করাটা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কতটুকু প্রিয়! আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা জিহাদ করা কতটুকু পছন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে, জিহাদই আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ও সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল।

সকল আমল/মেহনতের মধ্যে জিহাদই সর্বশ্রেষ্ঠ

عن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير أعمالكم الجهاد

হযরত হানযালা কাতিব (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, "তোমাদের আমল সমূহের মধ্যে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট আমল।" (তারিখে ইবনে আসাকির ১/৪৬৮)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ أَوْ أَىُّ الأَعْمَالِ خَيْرٌ قَالَ " إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ " . قِيلَ ثُمَّ أَىُّ شَيْءٍ قَالَ " الْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ " . قِيلَ ثُمَّ أَىُّ شَيْءٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলঃ সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কাজ কোনটি এবং উত্তম বা কল্যাণকর কোন্ ধরনের কাজ? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা। আবার প্রশ্ন করা হল, এরপর কোন্ জিনিস উত্তম? তিনি বললেনঃ জিহাদ হচ্ছে সকল কাজের চূড়া বা শিখর। আবার প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! এরপর কোন্ জিনিস উত্তম? তিনি বল্লেনঃ (আল্লাহ তা'আলার নিকট) কবুল হওয়া হাজ্ব। (বুখারী-২৬, মুসলিম-৮৩)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ الْعَمَلِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

আবূ যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা এবং মহান মহীয়ান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। (সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং-৩১২৯)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ " لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ " . فَرَدُّوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ " لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ " . فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ " مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُ الْقَائِمِ الصَّائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করে, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হল, "কোন কাজটি সওয়াবের দিক থেকে আল্লাহর পথে জিহাদের সমতুল্য?" রাসূলে আকরাম ﷺ বললেন, তোমরা সে কাজের মতো শক্তির অধিকারী নও।" সাহাবায়ে কিরাম দুই কিংবা তিনবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন। রাসূলে আকরাম প্রতিবার এটাই বলছিলেন, "তোমাদের এরূপ করার মতো শক্তি-সামর্থ্য নেই। এরপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত থাকে তার দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে রোযা রাখে, কিয়াম করে, আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করে, এবং নামায-রোযার ব্যাপারে গাফিল থাকে না (অনবরত করতেই থাকে যতক্ষণ না); মুজাহিদ জিহাদ শেষে বাড়িতে ফিরে আসে।" (বুখারী-২৮৯৬ ও মুসলিম, তিরমিজি)

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ. قَالَ " لاَ أَجِدُهُ ـ قَالَ ـ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُرَ وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ ". قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ

বুখারীর এক বর্ণনা হল: এক ব্যক্তি নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমায় এমন কোনো আমলের কথা বলুন যা জিহাদের সমতুল্য? তিনি ﷺ বললেন, "আমি এমন কোনো আমল তো দেখছি না।" তারপর আবার বললেন, "তুমি কি এতটা শক্তির অধিকারী, যখন জিহাদকারী আল্লাহর পথে বের হয়, তখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে, অতঃপর নামায পড়তে থাকবে, এবং গাফলতি করবে না এবং রোযা রাখবে কিন্তু ইফতার করবে না।" সে ব্যক্তি বললেন, "এ কাজ করার ক্ষমতা কার আছে?" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৭৮৫)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ " رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ " ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হল, কোন্ ধরনের মানুষ সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার পথে যারা জিহাদ করে। তারা আবার প্রশ্ন করলেন, তারপর কে? তিনি বললেনঃ পাহাড়ের কোনো উপত্যকায় যে মু'মিন আশ্রয় নিয়ে নিজের প্রতিপালককে ভয় করে চলে এবং মানুষকে নিজের অনিষ্ট হতে নিরাপদে রাখে।" (সহীহ্, তালীকুর রাগীব (২/১৭৩), নাসা-ঈ, জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬৬০)

عَنْ اَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ: أَىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَكْمَلُ إِيْمَانًا؟ قَالَ: رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللهَ فِيْ شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ، قَدْ كَفَى النَّاسَ شَرِّهِ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদি. হইতে আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হল, ঈমানদারদের মধ্যে সবচেয়ে কামেল ঈমানদার কে? তিনি ﷺ এরশাদ করলেন, "মানুষের মাঝে সবচেয়ে কামেল ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যিনি নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে। আর দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যিনি পাহাড়ী কোনো ঘাঁটিতে অবস্থান করে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করে এবং অন্যান্য মানুষকে নিরাপদ রাখে।" (আবু দাউদ- ২৪৮৫)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الأَوْدِيَةِ يُقِيمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ فِي خَيْرٍ " .

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ সর্বোত্তম জীবন হলো সে ব্যক্তির জীবন যে আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্যে ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে। শত্রুর উপস্থিতি ও শত্রুর দিকে আহ্বান শুনামাত্র ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে যথাস্থানে সে শত্রুকে হত্যা এবং নিজ শাহাদাতের সন্ধান করে। অথবা ঐ লোকের জীবনই উত্তম যে ছাগপাল নিয়ে কোন পাহাড় চূড়ায় বা (নির্জন) উপত্যকায় বসবাস করে আর

যথারীতি সলাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং আমৃত্যু তার প্রভুর 'ইবাদাতে নিমগ্ন থাকে। লোকটি কেবল মঙ্গলের মধ্যেই রয়েছে।" (সহীহ মুসলিম-৪৭৮৩)

عن إبن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس في الفتن رجل أخذ بعنان فرسه أو قال: برسن فرسه خلف أعداء الله، يخيفهم ويخيفونه، أو رجل معتزل في باديته يؤدي حق الله الذي عليه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي رحمه الله. (المستدرك على الصحيحين، ج:٤ ص:٥١٠)

"ফেতনার যামানায় শ্রেষ্ঠ মানুষ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর শত্রুদের পেছনে ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেও আল্লাহর শত্রুদের সন্ত্রস্ত করে তুলবে, তারাও তাকে ভয় দেখাবে। কিংবা সেই ব্যাক্তি, যে নিজ চারণভূমিতে নিভৃত জীবন অবলম্বন করে নিজের দায়িত্বে আল্লাহ পাকের যেসব হক আছে, সেগুলো পালন করবে।" (মুসতাদরাকে হাকেম, খ. ৪, পৃ. ৫১০)
ইমাম হাকীম রহ. হাদিসটিকে বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী রহ.ও তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

عن أم مالك البهزية قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها؟ قال رجل في ما شيته يؤدي حقها و يعبد ربه ورجل أخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه.

উম্মে মালেক বাহযিয়া রা. বলেন যে, নবী করীম ﷺ একদা ফেতনাসমূহের বর্ণনা দিলেন। খুলে খুলে সবকিছুর বিবরণ পেশ করলেন। তখন আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তখন সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে হবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, "ফেতনার যামানায় সবচেয়ে উত্তম

হবে সেই ব্যক্তি, যে তার ঘরবাড়ি ও পশুপালের মাঝে জীবন অতিবাহিত করবে, সেগুলোর হক্ব আদায় করবে এবং আপন রবের ইবাদতে নিমগ্ন থাকবে। আর সেই ব্যাক্তি, যে আপন ঘোড়ার মাথা ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে (সব সময় জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকবে) আর ইসলামের শত্রুদের সন্ত্রস্ত রাখবে। তারাও তাকে ভয় দেখাবে।" (সহীহ, আল ফিতান: খ. ১, পৃ. ১৯০)

عن عبد الرحمان بن زيد بن أسلم عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الجهاد حلوا أخضر ما قطر القطر من السماء، وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم: ليس هذا زمن جهاد، فمن أدرك ذلك الزمان، فنعم زمان الجهاد، قالو يا رسول الله : واحد يقول ذلك؟ قال نعم... من عليه لعنة الله والملاءكته والناس أجمعين.

নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন,"যতদিন পযর্ন্ত আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, ততদিন পর্যন্ত জিহাদ সতেজ ও সুমিষ্ট থাকবে। আর অদূর ভবিষ্যতে মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যে যুগের কিছু আলেম বলবে, এটি জিহাদের যুগ নয়। অতএব, যে ব্যক্তি সে যুগটি পাবে, তার জন্য সেটি হবে জিহাদের শ্রেষ্ঠ যুগ।" সাহাবায়ে কেরাম অবাক হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! একজন মুসলমান কি এমন কথা বলতে পারে? নবীজী ﷺ বললেন, "হ্যাঁ, এমন মুসলমানরা বলবে, যারা আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপে অভিশপ্ত।" (আস্‌সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, খ. ৩, পৃ. ৭৫১)

বর্তমান যামানা যে সেই ফিতনার যামানা, এটাকে অস্বীকার করার মতো কি কোনো উপায় আছে? কেননা বর্তমান যামানায়ই কতিপয় নামধারী আলেমের(?) মুখে এ ধরণের ভয়ানক কথা শুনা যাচ্ছে (এখন জিহাদের সময় নয়, বা এখন যা চলছে তা জিহাদ নয়, জিহাদ অন্য কিছু)।

সাহাবায়ে কেরামের ঢাল-তলোয়ারের যুদ্ধের সাথে বর্তমান যামানার কামান-ট্যাংকের যুদ্ধের তারা কোনো মিল খোঁজে পাচ্ছেন না। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

প্রিয় ভাই!

বর্তমানে সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন হাদীসে উল্লেখিত দুই শ্রেণি। এই দুই শ্রেণির মধ্যে আবার মুজাহিদে ইসলাম শ্রেষ্ঠ হবেন, সন্দেহ নেই। কেননা, যারা নিজের চারণভূমিতে অবস্থান করবে, তারাতো কেবল নিজের ঈমান হেফাযত করবে। পক্ষান্তরে 'মুজাহিদীনে ইসলাম' নিজেদের ঈমানের পাশাপাশি গোটা উম্মতের ঈমান ও অস্তিত্ব রক্ষার কাজে নিজের জীবনের বাজি লাগাবে। এর জন্য তারা বাড়ি-ঘর, পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান ও সহায়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে বুক পেতে দাঁড়াবে। তারা শত্রুদেরও হত্যা করবে, নিজেরাও শহীদ হবে।

লক্ষ্য করুন ভাই, হাদীসটিতে সশস্ত্র লড়াই ছাড়া 'হেকমত' খাটিয়ে জিহাদের অন্য কোনো ব্যাখ্যা করার অবকাশ আল্লাহর রাসূল ﷺ রাখেননি। কেননা তিনি জানতেন, তাঁর শেষ যামানার উম্মত জিহাদ থেকে পালানোর জন্য নানা রকম 'হেকমত' (?) ও 'উদ্ভট ফতোয়া' উদ্ভাবন করবে। তাই, তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহর পথের শত্রুদের মোকাবেলায় অস্ত্র হাতে বুকটান করে দাঁড়ানো, ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখা (যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা), কখন ডাক আসবে আমি রণাঙ্গনে ছুটে যাবো, ইসলামের দুশমনদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখা, তাদেরকে হত্যা করা, নিজেরাও শাহাদাত বরণ করা, এগুলো কারা করছেন?

আমার প্রিয় ভাই!

আপনিই উত্তর দিন, এই কাজগুলো কাদের??

এ কাজের কৃতিত্বের দাবীদার কি কেবল মাত্র দ্বীনের মুজাহিদ ভাইয়েরা নন???

তাহলে, আপনিই বলুন, ভাই-

তারা কারা, যারা ইসলাম নামক তরীটিকে কুফ্‌ফারদের বেষ্টনী হতে উদ্ধার করতে নিজেদের জীবন বাজি ধরছে?

তারা কারা, যারা মুসলমানদের হারানো গ্রাম ও শহরগুলোকে উদ্ধার করতে পাহাড়ের অন্ধকার গুহায় পাড়ি জমিয়েছে?

তারা কারা, যারা উম্মতের জন্য এক সাগর ব্যথা বুকে নিয়ে দিবানিশি ছটফট করতে থাকে?

তারা কারা, যারা ইরাক, সিরিয়া আর ফিলিস্তিনের নিরীহ শিশুদের নিরাপত্তার জন্য নিজের সন্তানদের এতীম করছে?

তারা কারা, যারা কাশ্মীরের মা-বোনদের ইজ্জত আর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য নিজের মা-কে সন্তানহারা করছে? নিজের স্ত্রীকে বিধবা করছে?

তারা কারা, যারা আরাকানের ভাই-বোনদেরকে জ্বলন্ত চিতার হাত হতে রক্ষা করতে নিজেরা জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হচ্ছে?

তারা কারা, যারা আপন যৌবনকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবান করে নিজের জীবনের সকল প্রেম-ভালোবাসাকে জলাঞ্জলি দিয়ে যাচ্ছে?

তারা কারা, যারা প্রিয় হাবীব ﷺ-এর উম্মতের মহব্বতে নিজের বুকের তাজা খুন প্রবাহিত করে চলেছে?

তারা কারা?

কারা তারা?

কেন তাদের কথা আমরা স্মরণ করি না?

কেন তাদেরকে আমরা একটু ভালোবাসতে পারি না?

কেন তাদেরকে আমরা 'জঙ্গী' ট্যাগ দিয়ে দূরে ঠেলে দেই?

কেন তাদের কুরবানী আর ত্যাগের কোনো মূল্য আমাদের কাছে নেই?

কেন আমরা তাদের জন্য দুই হাত তুলে একটু দুআও করতে পারি না?

হায়! আফসোস! আমরা কোথায় আছি ভাই, কেন আজ আমাদের এই অবস্থা???......

প্রিয় ভাই! আমরা কি চাই না, সেই সকল মর্দে মুজাহিদ ভাইদের সাথী হতে, যাদেরকে পবিত্র হাদীস শরীফে সর্বোত্তম আখ্যায়িত করা হয়েছে, যেন আমরাও ভাইদের কাতারে শামিল হতে পারি??

আমরা কি উম্মাহর 'শ্রেষ্ঠ সন্তান' হতে চাই না; আমরা কি শ্রেষ্ঠ মুমিন, শ্রেষ্ঠ ঈমানদার হতে চাই না???

মুহতারাম ভাই!

আপনি অবাক হবেন, জিহাদ কেবলই সর্বশ্রেষ্ঠ আমল নয়, বরং বর্তমান যামানায় জিহাদ করা অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় গুরুত্বের দিক থেকে কমপক্ষে পঞ্চাশ গুণ বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, এমনকি সাহাবায়ে কেরামের যামানার চেয়েও!

কি ভাই, বিশ্বাস হচ্ছে না???

عن أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ قَالَ قَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالَ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ

আবূ ছা'লাবাহ খুশানী রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "তোমাদের পরবর্তীতে আসছে ধৈর্যের যুগ। সে (যুগে) ধৈর্যশীল হবে মুষ্টিতে অঙ্গার ধারণকারীর মতো। সে যুগের আমলকারীর হবে পঞ্চাশ জন পুরুষের সমান সওয়াব।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! পঞ্চাশ জন পুরুষ আমাদের মধ্য হতে, নাকি তাদের মধ্য হতে?' তিনি বললেন, "না, বরং তোমাদের মধ্য হতে!" অন্য বর্ণনায় আছে, "তোমাদের পঞ্চাশজন শহীদের সমান সওয়াব!" (আবূ দাঊদ ৪৩৪৩, তিরমিযী ৩০৫৮, ইবনে মাজাহ ৪০১৪, ত্বাবারানী ১৮০৩৩, সঃ জামে' ২২৩৪ নং)

অর্থাৎ, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, ফেতনার যামানার একজন শহীদ সাহাবাদের সময়কার পঞ্চাশ জন গলাকাটা শহীদের সমান সওয়াব লাভ করবে (গুরুত্বের বিচারে)। সুবহানাল্লাহ! এ থেকেই বুঝা যায়, শেষ

যামানায় জিহাদের গুরুত্ব, জটিলতা এবং ভয়াবহতা নবুয়তের যামানা অপেক্ষা পঞ্চাশ গুণ বেশি হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন?

কারণ-

- সাহাবায়ে কেরামের যামানায় স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ জিহাদের নেতৃত্বে ছিলেন, বর্তমানে তেমন কেউ নেই।
- সেই যামানায় নবীজী ﷺ বর্তমান থাকায়, সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের শক্তি ছিল বর্ণনাতীত। কিন্তু বর্তমানে যত দিন যাচ্ছে, উম্মতের ঈমানী শক্তি ততই হ্রাস পাচ্ছে।
- সেই যামানায় মুসলমানদের খিলাফত ছিল, বর্তমানে কোনো খিলাফত নেই।
- সেই যামানায় সাহাবায়ে কেরাম গুনাহমুক্ত ছিলেন বিধায়, আল্লাহর সাহায্য সহজেই আসত, বর্তমানে উম্মত গুনাহ ছাড়তে পারছে না বিধায় আগের মত মদদ নুসরত পাওয়া যাচ্ছে না।
- সেই যামানায় কুফ্ফারদের শক্তি ও সংখ্যা সাধারণত মুসলমানদের চার থেকে ছয়গুণ হতো, কিন্তু বর্তমানে কুফ্ফারদের শক্তির সাথে মুসলমানদের শক্তির কোনো তুলনাই চলে না।
- হাকীকত হচ্ছে, কুফ্ফারদের আছে পারমাণবিক বোমা আর মুসলমানদের কাছে ইট-পাটকেলও নেই।
- বর্তমান যামানার যে কোনো যুদ্ধ পূর্বের যে কোনো যুদ্ধের চেয়ে বেশি ভয়ানক, বেশি ধ্বংসাত্মক, বেশি ক্ষয়-ক্ষতি বয়ে আনে।

- সেই যামানায় দেড় হাজার সাহাবী পৃথিবী জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল, বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে দুনিয়াপ্রীতি ও মৃত্যুর ভয় (ওয়াহন) প্রবেশ করায় একশ সত্তর কোটি মুসলমানও বানের পানিতে ভেসে আসা খড়কুটোর মতো (মূল্যহীন ও দুর্বল) হয়ে গেছে। তাই কুফ্ফাররা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করছে।

এহেন কঠিন ও মারাত্মক পরিস্থিতিতে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমানের কারণে, তাঁদের প্রতি মহব্বতের কারণে, তাঁদের খবরকে সত্য বিশ্বাস করার কারণে, জিহাদের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে, নিজের জীবন বাজি লাগাবে, দুনিয়ার সকল সুখ-শান্তি, চাওয়া-পাওয়াকে আল্লাহর জন্য কুরবানি করবে, তারা উত্তম হবে না তো কারা হবে???

আমরা যারা ঘরে বসে আছি, কোন্ যুক্তিতে আমরা এই সকল মরদে মুজাহিদ্দের সমান বা উত্তম হবো???

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ٩٥

"৯৫. গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান (যারা লড়াই করার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং জিহাদ ত্যাগ করার)- যাদের কোনো সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ

সব মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারা সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন। ৯৬. এগুলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (৪ সূরা নিসা :৯৫-৯৬)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জিহাদের গুরুত্ব বুঝার তাওফীক দান করেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

তাহলে, বর্তমানে আমরা কিভাবে জিহাদ করব বা জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত হব?

প্রিয় ভাই! সেটা দুই ভাবে হতে পারে-

- **জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রথম উপায়:**

মুজাহিদ ভাইদের কোনো হক্ব জামাতের সাথে জুড়ে যাওয়া। এটিই সর্বোত্তম ও সহজতম উপায়। এক্ষেত্রে, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে কবুল করেন এবং আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বানী করা শেষ জামানার হক জামাত "কালো পতাকার বাহিনী"র সন্ধান পেয়ে যাই এবং ভাইদের সাথে জুড়তে পারি তো আলহামদুলিল্লাহ। এটিই আমার জন্য সবচেয়ে খোশনসীব এবং সৌভাগ্যের বিষয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুন। আমীন। অতঃপর, তানজীমের বা ইমারাহ্‌র পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়, তা পালন করতে থাকা।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ فَيُوَطِّئُونَ لِلْمَهْدِيِّ " . يَعْنِي سُلْطَانَهُ .

© Rahmat Gul/AP/picture alliance

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "প্রাচ্য দেশ থেকে কতক লোকের উত্থান হবে এবং তারা (ইমাম আল্) মাহ্দীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে।" (ইবনু মাজাহ। দঈফাহ ৪৮২৬, দঈফ আল-জামি ৬৪২১)

تخرج من خرسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلياء

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "খুরাসান (বর্তমান আফগানিস্তান) থেকে (ইমাম আল মাহদীর সাহায্যকারী) কালো বর্ণের পতাকাবাহী সৈন্যদল বের হবে। অবশেষে তা বাইতুল মুকাদ্দাসে স্থাপিত করা হবে। কোনো কিছুই তাকে প্রতিহত করতে পারবে না।" (আত-তিরমিযি: ২২৬৯, মুসনাদে আহমাদ: ৮৭৬০)

اذا رأيتم الريات السود قد جاءت من قبل خراسان فاءتوها فان فيها خليفة الله المهدي

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, "যখন তোমরা দেখবে, কালো পতাকাগুলো খোরাসানের দিক থেকে এসেছে, তখন তাদের সাথে যুক্ত হয়ে যেও। কেননা, তাদেরই মাঝে আল্লাহর খলীফা মাহদী থাকবে।" (মুসনাদে আহমদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৭৭; কানজুল উম্মাল, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ২৪৬; মেশকাত শরীফ, কেয়ামতের আলামত অধ্যায়)

تطلع الرأيات السود من قبل المشرق فيقاتلونكم قتلا لم يقتله قوم اذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج

"পূর্বদিক থেকে কালো পতাকাবাহী বাহিনীর আবির্ভাব ঘটবে। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে এত কঠিন লড়াই করবে, যা ইতিপূর্বে কোন জাতি করেনি, তাদেরকে আবির্ভূত হতে দেখলে তোমরা বরফের উপর হামাগুড়ি

দিয়ে হলেও তাদের দলে যোগ দিবে।" (সুনানু ইবনি মাজাহঃ ৪০৮৪; মুসতাদরাকুল হাকিম:৮৪৩২; মুসনাদ আহমাদ:২২৩৮৭)

ইমাম ইবনে কাসির রহ. বলেছেন, হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী। হাকীম রহ. বলেছেন: এটি বুখারী-মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ। ইমাম জাহাবীও তার সাথে একমত হয়েছেন।

فمن أدرك ذلك منكم، فليأتهم ولو حبوا على الثلج

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে যারা সে যুগ পাবে, তারা যেন বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের নিকট চলে যায়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ফিতনা অধ্যায়, হাদিস নং- ৪০৮২)

• জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দ্বিতীয় উপায়:

যারা কালো পতাকার বাহিনীতে এখনো যোগদান করতে পারেননি, তাদের জন্য করনীয় হল-

১. নিজে জিহাদের জন্য খালেছ (খাঁটি) নিয়ত করা। শাহাদাতের হক্ব তামান্না পোষণ করা।

২. নিজে জিহাদের শরয়ী ইলম (ফাযায়েল ও মাসায়েল) শিক্ষা করা। [তাওহীদ ও জিহাদের উপর প্রায় ২০০ টি কিতাবের একটি আর্কাইভ: লিংক: https://bit.ly/3e9omas। অথবা পাশের QR Code-টি স্ক্যান করে অবশ্যই Tor Browser দিয়ে সার্চ করুন। উক্ত কিতাবগুলো পড়া যেতে পারে, ইনশাআল্লাহ।

৩. নিজে শারীরিকভাবে ফিট (জিহাদের উপযুক্ত) থাকা। এজন্য নিয়মিত শরীরচর্চা করা।

৪. সর্বদা এমন নিয়ত রাখা যে, সুযোগ/সন্ধান পেলেই মুজাহিদ বাহিনীর সাথে জুড়ে যাব।

৫. হক তামান্নার সাথে মুজাহিদ ভাইদের হক জামাত তালাশ করতে থাকা এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুলিয়তের জন্য দোয়া করতে থাকা।

অতঃপর নিজের সাধ্যমত নিচের কাজগুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকা-

০৬. নিজের সম্পদ দ্বারা জিহাদ করা
০৭. যারা জিহাদে যাচ্ছে তাদের প্রস্তুত হতে সাহায্য করা
০৮. মুজাহিদীনগণ তাদের যে সকল পরিবারবর্গকে রেখে গেছেন তাদের দেখাশোনা করা
০৯. শহীদের পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা
১০. আহত এবং কারারুদ্ধ মুজাহিদীনদের পরিবারের দেখাশুনা করা
১১. মুজাহিদীনদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা
১২. মুজাহিদীনদেরকে যাকাত প্রদান করা
১৩. আহতদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা
১৪. মুজাহিদীনদের প্রশংসা করা, তাঁদের কাজের যৌক্তিকতা তুলে ধরা এবং মানুষদেরকে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার দিকে আহবান করা
১৫. মুজাহিদীনদের অনুপ্রেরণা প্রদান করা এবং তাঁদেরকে (জিহাদ) চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করা
১৬. মুজাহিদীনদের পক্ষে কথা বলা এবং তাদের সমর্থন দেয়া
১৭. মুনাফিক এবং বিশ্বাসঘাতকদের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে দেয়া
১৮. মানুষদেরকে জিহাদের দিকে ডাকা এবং উদ্বুদ্ধ করা

১৯. মুসলিম এবং মুজাহিদীনদেরকে পরামর্শ দেয়া
২০. মুজাহিদীনদের গোপন বিষয় গুলো গোপন রাখা যাতে করে তা থেকে শত্রুরা উপকৃত হতে না পারে
২১. মুজাহিদীন এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য দু'আ করা
২২. সঙ্কট কালীন দু'আ (কুনুত আন-নাওয়াযিল) বেশি বেশি পড়া
২৩. জিহাদের সংবাদ সংগ্রহ করা এবং তা প্রচার করা
২৪. তাঁদের প্রকাশিত বই ও প্রকাশনা ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করা
২৫. এরূপ ফাতাওয়া দেয়া যা তাঁদের সাহায্য করবে
২৬. আলেম ও দ্বীনের দা'য়ীদের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং তাঁদেরকে মুজাহিদীনদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা
২৭. অস্ত্র দ্বারা প্রশিক্ষণ নেয়া এবং বন্দুক চালনা করতে শেখা
২৮. সাঁতার কাটতে এবং ঘোড়ায় চড়তে শেখা
২৯. প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান অর্জন করা
৩০. মুজাহিদীনদের আশ্রয় দেয়া এবং তাদের সম্মান করা
৩১. কাফিরদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা এবং তাদের ঘৃণা করা
৩২. বন্দীদের মুক্ত করার চেষ্টা বৃদ্ধি করা
৩৩. বন্দীদের সংবাদ প্রচার করা এবং তাদের বিষয়ে সচেতন থাকা
৩৪. সতর্কতার সাথে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার জিহাদ চালিয়ে যাওয়া
৩৫. কাফিরদের বিরুদ্ধাচরণ করা
৩৬. সন্তানদের জিহাদ ও এর সাথে সংশ্লিষ্টদের ভালোবাসার মানসিকতা দিয়ে গড়ে তোলা
৩৭. বিলাসীতা ত্যাগ করা
৩৮. শত্রুদের পণ্য সামগ্রী বর্জন করা
৩৯. যারা যুদ্ধ করে (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) (হারবিইয়্যিন), তাদের থেকে অধিনস্ত হিসেবে কর্মী নিযুক্ত না করা (উদাহরণ স্বরূপ, আপনি

কোন হিন্দুকে আপনার কোন কাজে নিয়োগ দিবেন না; কারণ হিন্দুরা কাশ্মীরে আমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে)

বিস্তারিত পড়ুন: Tor Browser দিয়ে (অবশ্যই) ডাউনলোড করুন
https://archive.org/details/39_20220827

অথবা পাশের QR Code-টি স্ক্যান করে অবশ্যই Tor Browser দিয়ে সার্চ করুন:

- কিভাবে অনলাইন/মিডিয়া জিহাদের সাথে যুক্ত হবো?
  - **প্রথম উপায়:**

Tor Browser দিয়ে (অবশ্যই) নিচের লিংকগুলো ভিজিট করুন-

লিংক ০১:- https://gazwah.net/?p=32007

লিংক ০২:- https://bit.ly/3ANzGBU

অথবা নিচের QR Code-টি স্ক্যান করে অবশ্যই Tor Browser দিয়ে সার্চ করুন:

লিংক-০১

লিংক-০২

➢দ্বিতীয় উপায়:

নিচের ওয়েবসাইটগুলোতে Tor Browser দিয়ে (অবশ্যই) নিয়মিত ভিজিট করুন:

https://dawahilallah.com

https://alfirdaws.org

https://gazwah.net

https://fatwaa.org

https://darulilm.org

https://islamiclibrery.site123.me/

https://mafahim.net

প্রিয় ভাই! আমাদেরকে মনে রাখতে হবে-

জিহাদে অংশগ্রহনের জন্য প্রথম ধাপে কাজ না করা পর্যন্ত আমাদের জিহাদ করার ফরয (ফরযে আইন) আদায় হবে না। দ্বিতীয় ধাপে কাজ করার দ্বারা আমরা সাময়িকভাবে জিহাদের প্রস্তুতিমূলক কিছু কাজ করলাম মাত্র, যা অপূর্ণ এবং আংশিক। আমাদেরকে অবশ্যই প্রথম ধাপে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জিহাদে সার্বিকভাবে অংশগ্রহণের তাওফীক দান করুন। আমীন।

"কিতাবুত্ তাহ্‌রীদ 'আলাল ক্বিতাল"

দ্বিতীয় পর্ব: তাওহীদ ও জিহাদ

কিতাবুত্ তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল

পর্ব: ০২

তাওহীদ ও জিহাদ

কিতাবটি অনলাইনে পেতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন:

Tor Browser

প্রথম ধাপ: প্রথমে আপনার পিসি বা এন্ড্রয়েড ফোনে Tor Browser (টর ব্রাউজার) ইনস্টল করুন।

Tor Browser ইনস্টল করতে নিচের কিউআর কোড গুলো স্ক্যান করে প্রাপ্ত লিংক থেকে ডাউনলোড করে নিন।

Tor Browser Download for PC

Tor Browser Download for Android

দ্বিতীয় ধাপ: ইনস্টল করার পর Tor Browser (টর ব্রাউজার) অবশ্যই ওপেন করে নিন।

তৃতীয় ধাপ: এবার নিচের যে কোনো একটি কিউ আর কোড স্ক্যান করে প্রাপ্ত লিংকটি অবশ্যই Tor Browser (টর ব্রাউজার) দিয়ে সার্চ করুন।

দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্ পোস্ট লিংক:

আর্কাইভ লিংক:

মেগা লিংক

এনোনফাইল্স লিংক
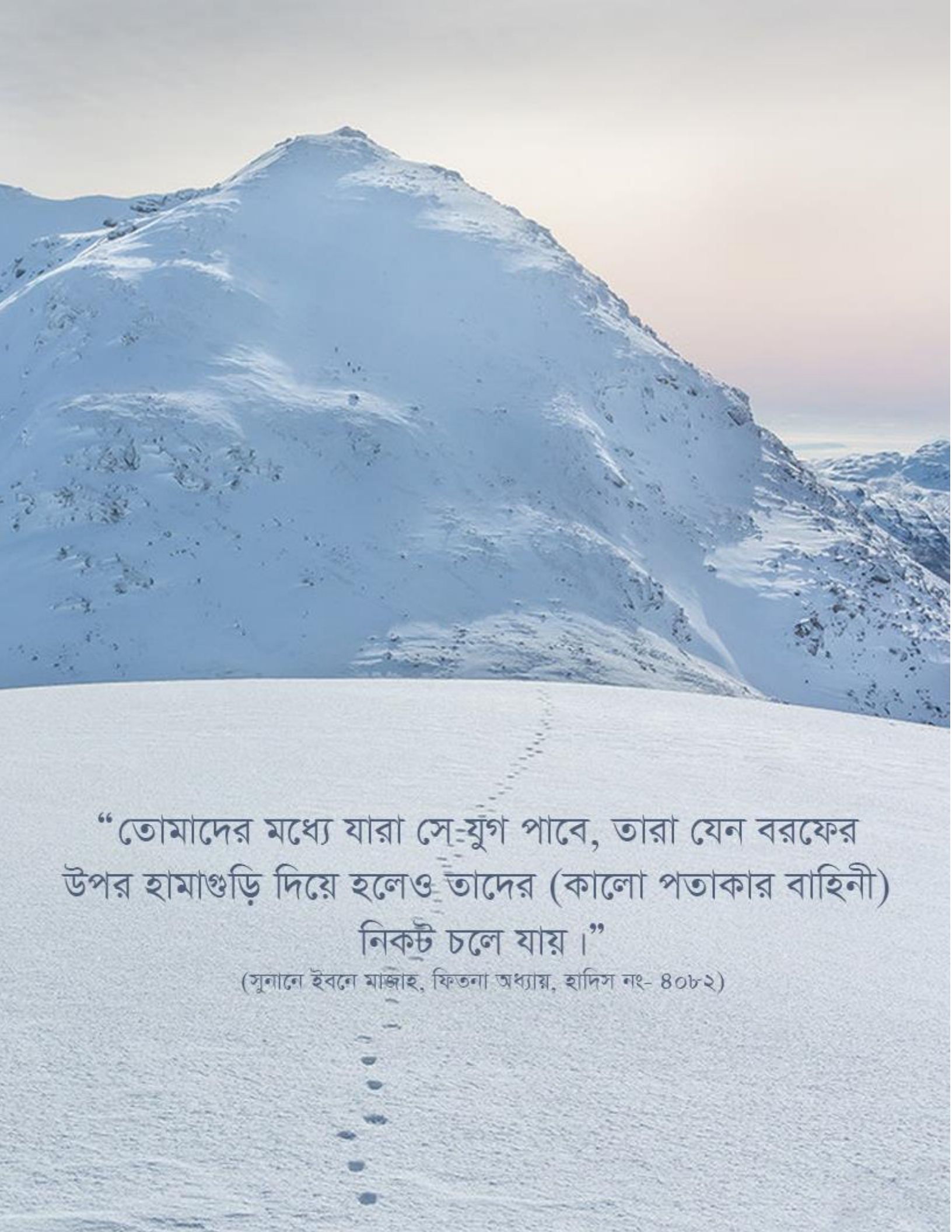
"তোমাদের মধ্যে যারা সে-যুগ পাবে, তারা যেন বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের (কালো পতাকার বাহিনী) নিকট চলে যায়।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ফিতনা অধ্যায়, হাদিস নং- ৪০৮২)